ভূমিকা

এই আখ্যায়িকার মধ্যে যে সকল ঐতিহাসিক উপকরণ আছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

অনুমান ১৩২৫ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুদাশ ফৌজদার নামক এক ব্যক্তি তাঁহার দুই ভ্রাতা নীলাম্বর ও দিগম্বর সহ ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। যে কুলুজিতে এই কথা উল্লিখিত আছে তাহার হাতের লেখা ১৬৩৯ শকের (১৭১৭ খৃঃ)। অশীতিপর বৃদ্ধ স্বর্গীয় দেবীচরণ দাশ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, দাশদিগকে ঐ গ্রামে আনিয়াছিলেন তাঁহাদের আত্মীয় বৈশ্বানর গোত্রের রাজারা; তাঁহাদের পরিবারের ইহাই চিরন্তন প্রবাদ। বিষ্ণুদাশ ফৌজদার ও তাঁহার ভ্রাতারা সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। 'চন্দ্র-প্রভায়' দৃষ্ট হয়, ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পম্বদাশ ছিলেন বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি। তিনি সপ্ত-গ্রাম সন্নিহিত বালিনছি গ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পম্বদাশ হইতে বিষ্ণুদাশ ফৌজদার ষষ্ঠ স্থানীয়। আবুল ফজলের আইন আকবরীতে দৃষ্ট হয়, ৫০০০ সৈন্যের অধিনায়কেরা 'ফৌজদার' উপাধি পাইতেন। এতদ্বারা প্রমাণ হয় যে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দেও এই দাশবংশ মুসলমান রাজদরবারে সম্মানিত পদ অধিকার করিয়াছিলেন। এই বংশের এক শাখা উত্তরকালে বর্দ্ধমানের শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস স্থাপন করেন,—সুপ্রসিদ্ধ নরহরি সরকার সেই বংশোদ্ভব।

বিষ্ণুদাশ ফৌজদার শুধু রাজদরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন না, তিনি বল্লাল-প্রদত্ত কৌলিন্য প্রাপ্ত ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম পশুদাশের বংশধর ছিলেন। বল্লালের সময়ে নানা কারণে কৌলিন্য বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সেনের দ্বারা মুসলমান বিজয়ের অনতিকাল পরে বাঙ্গালা দেশে কৌলিন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন কুলীনদের সামাজিক সম্মান রাজা-মহারাজদের মত ছিল। বিষ্ণুদাশ ফৌজদারের মত সমাজ-পূজ্য, রাজদরবারে বিশিষ্ট-পদ-প্রাপ্ত ব্যক্তি কি জন্য বালিনছি শ্রীখণ্ড প্রভৃতি রাঢ় অঞ্চলের সমৃদ্ধ পল্লী ও মর্য্যাদাপন্ন জ্ঞাতিদিগকে ছাড়িয়া পূর্ব্ব বঙ্গের এক কোণে আসিয়া বাস স্থাপন করিলেন, প্রথমেই এই সমস্যাটির কথা মনে উদয় হয়।

দেখা যায়, যে সময় বিষ্ণুদাশ সুয়াপুরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন, সে সময় মুসলমানেরা সবেমাত্র পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়ের অভিযান করিয়াছেন। বৈশ্বানর গোত্রের রাজাদের সঙ্গে মুসলমান গাজিদের যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আছে। একখানা কুঠারাহত কৃষ্ণ পাথরের বাসুদেব মূর্ত্তি সেই রাজাদের বাড়ীর সন্নিহিত পুকুরে পাওয়া গিয়াছে; তাহা অধুনা রোয়াইল গ্রামে অভয় চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আছে। ইহা ছাড়া প্রস্তরের স্তম্ভের ভাঙ্গা এক অংশ সেই দীঘিতে পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সুয়াপুরের দক্ষিণে কানাই নদ বহিয়া যাইত, কানাই ও বংশাই নদ ধলেশ্বরীর শাখা। সম্প্রতি তটভূমি ভাঙ্গিয়া ধলেশ্বরীর সঙ্গে কানাই নদ মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত কানাই নদ গাজিদের প্রদত্ত "গাজিখালি" নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু রেণেলের

মানচিত্রে 'গাজিখালি' নামের পরিবর্ত্তে কানাই নাম পাওয়া যায়, সুতরাং বুঝা যাইতেছে সার্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বেও 'গাজিখালি' নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই।

এখন অবসর প্রাপ্ত সবজজ ত্রৈলোক্যনাথ রায়ের বাড়ীর কাছে শতদল চক্রবর্ত্তীর বাস্তভিটার অনতিদূরে একটা স্থান বৃদ্ধেরা "রাজপাড়া" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। শশধর বাবুর মাতা তাঁহার প্রয়োজনে সেই স্থানের কতকটা খনন করায় একটা ছাদ বাহির হইয়া পড়ে। উহাই প্রাচীন রাজবাড়ীর ছাদ বলিয়া কেহ কেহ বলিয়াছিলেন। শশধর বাবুর মাতা অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সেই খনন-কার্য্য স্থগিত রাখেন। ঐ স্থানের অনতিদূরে পূর্ব্বে চন্দ্রমোহন দাশের বাড়ী যে স্থানে ছিল, তৎসংলগ্ন পুকুরের দক্ষিণে খানিকটা উচ্চ স্থানকে লোকে সেদিন পর্য্যন্তও "কোট বাড়ী" বলিত। "কোট বাড়ী" বলিতে সেকালে দুর্গ বুঝাইত। রাজবাড়ীর অল্প পশ্চিম-দক্ষিণে—যেখানে ৺রেবতী চক্রবর্ত্তীর বাড়ী—সে স্থানটী লোকে পূর্ব্বে 'হাতীর পিলখানা' বলিত। সুতরাং রাজবাড়া, দুর্গ ও হাতীর পিলখানার প্রমাণ পাওয়া গেল। মুসলমানেরা আসিয়া যে মন্দিরটি ধ্বংস করিয়াছিলেন, সে মন্দিরটি রাজবাড়ীর খুব সন্নিহিত। এখন যেখানে দাশদের প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন রাধাকান্তের মন্দির, তাহার ঠিক দক্ষিণে একটা ভিটি আছে,—সেইখানে এই মন্দিরটি অবস্থিত ছিল, যাঁহারা ইহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছেন—তাঁহারা বলিয়াছেন, সেই মন্দিরটি দোচালা ঘরের আকৃতি-বিশিষ্ট ছিল।

মুসলমানদের মধ্যে গাজিদের প্রভাব এতদঞ্চলে খুব বেশী

রকম হইয়াছিল, নবীনচন্দ্র ভদ্র প্রণীত ভাওয়ালের ইতিহাসে তাঁহাদের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। ইহারাই কানাই নদকে গাজিখালি নামে পরিচিত করিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ সুয়াপুর-বিজয়ের পরে মুসলমান জেতারাই বৈশ্যানর গোত্রীয় রাজাদের আত্মীয় অথচ মুসলমান রাজদরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুদাশ ফৌজদারের হাতে সুয়াপুরের বিশাল জমিদারী অর্পণ করিয়াছিলেন।

এই বিস্তৃত জমিদারী পাইয়াই বিষ্ণুদাশ ফৌজদার ভ্রাতাদের সঙ্গে এই অঞ্চলে চলিয়া আসিয়া থাকিবেন। সুয়াপুর-বিজয়ের পরে মুসলমান জেতা যেখানে ইদ-উৎসব করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেই স্থানটি কিছুকাল পূর্ব্বেও 'ইদগড়' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ৺রজনী গুপ্ত ও ৺হরিমোহন চক্রবর্ত্তীর বাস্তভিটার পূর্ব্বদিকের পুষ্করিণীর উত্তর পাড়টার নাম 'ইদগড়' ছিল। ইহা বৃদ্ধলোকদের নিকট শুনিয়াছি।

বিষ্ণুদাশ ফৌজদার ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশ ইদানীং কালে সুয়াপুরের আদি জমিদার এবং ইহাদের নানা কীর্ত্তি-চিহ্নের ভগ্নাবশেষ এখনও সেই গ্রামে বিদ্যমান। কোট বাড়ীর অনতিদূরে যে বিশাল ভূখণ্ড জুড়িয়া ইহারা বাস স্থাপন করিয়াছিলেন—তাহার চতুর্দ্দিকে গড়খাই ছিল,—এখনও বিশেষ সন্ধান করিলে গড়খাইএর চিহ্ন দৃষ্ট হইবে। রাধাকান্ত-মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া ৺অভয় সেনের বাড়ী পর্য্যন্ত যেখানে মাটী খোঁড়া যায়, সেইখানেই ভগ্ন প্রাচীর ও বাড়ীর চিহ্ন ছোট ছোট ইষ্টকাদি দৃষ্ট হয়। একটি বাড়ীর একতলাটা সম্পূর্ণ মাটীর নীচে বসিয়া গিয়াছিল

এবং দ্বিতলের কিছু অংশ ভগ্নধ্বজের ন্যায় সেদিন পর্য্যন্তও জাগিয়া ছিল। দাশদিগের জনৈক বংশধর দিবাকর দাশ-খনিত বিশাল দীঘি এখন শুকাইয়া গিয়াছে এবং সেই স্থানের উপর ৺বামাচরণ সেনের বাড়ী হইয়াছে।

প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে শিবশঙ্কর দাশ রাধাকান্তের যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা নানা কারুকার্য্য-সমন্বিত ছিল। বিষ্ণুদাশের বংশধর অধ্যাপক ডাক্তার তমোনাশ দাশ সেই মন্দিরস্থিত কারুকার্য্যভূষিত একখানি কাঠের সিংহাসনের ভগ্নাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে উপহার দিয়াছেন।

এই দাশেরাই প্রসিদ্ধ গুপ্ত বংশীয়দিগকে সুয়াপুরে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। গুপ্ত বংশে সিবিলিয়ন জজ কেদার নাথ রায় ও তাঁহার দুই সিভিলিয়ান পুত্র মিঃ জে, এন, রায় ও এস্, এন, রায়, সুপ্রসিদ্ধ সদরওয়ালা কালীকিঙ্কর রায়, শ্রীনাথ রায় ও ঢাকার শ্রেষ্ঠ উকিল বরদা কিঙ্কর রায় এবং লালাবাবু প্রভৃতি প্রথিতযশা লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু মনে হয়, সুয়াপুরের অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে যে ৭।৮টি ভিটি 'বাজাসনের ভিটি' নামে পরিচিত, তাহাই এই অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান ও প্রাচীনতম কীর্ত্তি। নিবারণ চন্দ্র দাশ নামক একজন সেটেলমেণ্ট অফিসার বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থানীয় জমিদারদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই ভিটিগুলির একটির খনন-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি এই ভিটিতে বিশাল একটা স্রোতৃ-গৃহের ভিত খুঁড়িয়া পাইয়াছিলেন, প্রস্তরের ও মাটীর বুদ্ধমূর্ত্তি ও নানাবিধ প্রাচীন বৌদ্ধাধিকারের ভগ্নাবশেষ তথায় আবিষ্কৃত

হইয়াছিল। তাহা যে পারিয়াছিল, সেই লইয়া গিয়াছিল। সহসা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্থানান্তরিত করাতে এই খনন-কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন স্তূপগুলি বৎসরের পর বৎসর বর্ষার জলে মাটীর নীচে বসিয়া যাইতেছে।

এই বাজাসনের সংলগ্ন পশ্চিম প্রান্তে যে গ্রাম—তাহার নাম নান্না। 'নান্না' শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে 'মুণ্ডিত মস্তক' অর্থে ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতর বাজাসন বা বজ্রাসনের মুণ্ডিতশির ভিক্ষুরা এই গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামে যে কালী প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা বহু প্রাচীন। বৌদ্ধ প্রতিপত্তি লোপের শেষদিকে এই বাজাসন বিহার ঘোর তান্ত্রিকতার ব্যভিচারে পূর্ণ হইয়াছিল; এখনও লোকের কথায় প্রচলিত আছে—"সুয়াপুর নান্না, মদে ভাতে পান্না।" দিবাকর দীঘি যেখানে ছিল, তাহা খুঁড়িয়া অনেক নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, প্রবাদ এইস্থান ডাকাতদের আড্ডা ছিল।—অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে নিম্ন শ্রেণীর বৃদ্ধেরা কলহ করিয়া বলিত "তোকে দিবাকরে দিব"—দিবাকর তখন শ্মশান-ঘাটার বিভীষিকার প্রবাদ জড়িত ছিল। এই পল্লীতে ভদ্রবংশের পুরুষ ও স্ত্রীরাও যে ভৈরবী-চক্রে বসিয়া নির্লজ্জ ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামবাসী রমানাথ সেন চণ্ডালের শবের উপর বসিয়া তান্ত্রিক যোগ সিদ্ধি লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়া এক অমাবস্যা রাত্রে নিহত হন, লোকে বলে তিনি ভূতের হাতে মারা গিয়াছিলেন, তাহার গণ্ডদেশে ভীষণ চাপড়ের দাগ ছিল। সেদিন পর্য্যন্তও মদের প্রবাহ এই অঞ্চলে অবাধে চলিয়াছিল। শিবশঙ্কর দাশের সময় পর্য্যন্ত দাশবংশের এতটা সমৃদ্ধি ছিল যে, এই

মহামনা ব্যক্তি একাই সেই গ্রামের ২২টি দুর্গোৎসবের ব্যয় বহন করিতেন। মদ্যের অবাধ স্রোতে সেই সমৃদ্ধি আজ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

সম্ভবতঃ বিষ্ণুদাশ ফৌজদার যখন প্রথম সুয়াপুরে আসেন, তখনও বাজাসনের প্রাধান্য কিছু কিছু ছিল, কারণ ইঁহারা "বাজাসনের দাশ," ও হরিমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকটি ব্রাহ্মণ" বাজাসনের চক্রবর্ত্তী" 'নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এই নামে অভিহিত হইলে ইঁহারা ভীষণ চটিয়া যাইতেন। বাজাসনের বৌদ্ধ-বিহারে তান্ত্রিক অধোগতির জন্য ইহা উত্তর-কালে অত্যন্ত নিন্দিত হইয়াছিল বলিয়াই হয়তঃ এই বিরক্তির কারণ ঘটিয়া থাকিবে। এই ভাবে এ দেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার ও তৎসহ বৌদ্ধ স্মৃতির বিলোপ ঘটিয়াছে। বাজাসন হইতে ৫।৬ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ ধামরাই গ্রাম—পূর্ব্বকালের একটা বৃহৎ ঐতিহাসিক কেন্দ্র। প্রাচীন কাগজ পত্রে এই গ্রামের "ধর্ম্ম রাজিকা" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি অশোকের বহু সংখ্যক "ধর্ম্ম রাজিকার" অন্যতম,—ইহাতে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। এই গ্রামে বিখ্যাত যশোমাধবের অতিকায় রথ ও সুদর্শন বিগ্রহ বিদ্যমান এবং ইঁহাতে প্রতিবৎসর বর্ষাকালে যে মেলা বসিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্ব বঙ্গের একটা বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান।

ভাওয়ালের ইতিহাসে নবীনচন্দ্র ভদ্র দীঘল ছিটের চণ্ডাল বংশীয় রাজা প্রসন্ন ও প্রতাপ রায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের এক ভগ্নী ছিলেন, তাহার নাম মঘী। সাভারে হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ী

এখনও ভগ্নস্তূপে পরিণত। তথাকার এক মঠে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

নম সুগতায়

যে জাতো বীরবর মহিতাদিন্দু বংশৌযধেশাৎ
ধীমন্তো ধীরবরঃ মুকুটাৎ ভীমসেনান্নৃপেন্দ্রাৎ।
সোদর্য্যে বৈর্দশবল গেতত্বান্বিরাঙ্কঃ স গেহাৎ
আয়াতিস্মাদ্রিবন নশিতে ভাবলীনে প্রদেশে ॥ (১)

বংশাবতী ব্রহ্মাযুত প্রবিষ্টং
দক্ষেণ গাঙ্গং স চ ভাবলীনং।
ধীমন্ত সেনঃ সহসৈন্য যোধৈ
রাক্রামতি স্মা প্রবলাৎ কিরাতাৎ ॥ (২)

ধীমন্ত পুত্রো রণধীর-সেনঃ
সংগ্রাম জেতা ইব কার্ত্তিকেয়ঃ।
হিমালয়-ব্যাপ্ত দেশান্ বিজিত্য
সম্বার পুর্য্যামবসৎ প্রবীরঃ ॥ (৩)

হরিশচন্দ্রো মহারাজঃ রণধীরস্ত পুত্রকঃ
ধর্ম্মেশ ইব ধর্ম্মাত্মা ধনাঢ্য কুবেরাধিকঃ। (৪)

নৃপেন্দ্রবংশমার্ত্তন্ত হরিশ্চন্দ্র ইবাভবৎ।
প্রশস্তিলোকান সর্ব্বান্ স অথবা ইব রাঘবঃ ॥ (৫)

যমলাত্রাসিনী (?) তীরে বৌদ্ধাঙ্ক-মঠমন্দিরে
বিজনে চ স রাজর্ষি ধর্ম্মার্থং স্মাবতিষ্ঠতে। (৬)

ভিষককুলে চেন্মলিনঃ শশাঙ্কঃ
সমুজ্জ্বলঃ কিন্ত্বিব পূর্ণচন্দ্রঃ।
রাজর্ষিণা কণ্টক-শাখি-শৈলা
সুবাসিতা বৈ মলয়াদ্রি জেন॥ (৭)
হরিশ্‌চন্দ্রস্য পুত্রেণ মহেন্দ্রেণ মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতো দত্তঃ
ক্ষপর্ণং বৈ মহেশ্বরং
প্রণম্য সুগত্যং দেব রচিতা শামলী ময়া কবীন্দ্র
শিবদেবেন ভিষগ্‌ মাধবসুনুনা।
শকাব্দাঃ—(অস্পষ্ট)

এই শিলালিপিখানি "ঢাকা রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎ-প্রণীত বৃহৎ বঙ্গের ২৭৭-৩২৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। কথিত আছে, হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অদুনা ও পদুনাকে রাজা গোপীচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন। দেখা যায় ধর্ম্মপাল, লাউসেন, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ময়নামতীর গানের সকল চরিত্রই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সে সময় জন-সাধারণ ইহাদিগকে "ধর্ম্মপূজক" নামে অভিহিত করিত। হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ীর ভগ্নস্তূপে বহু বৌদ্ধ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তাহার অনতিদূরে শিশুপালের গড় ও যশোপালের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ কিছু পূর্ব্বেও দৃষ্ট হইত। বাজাসনের সমীপবর্ত্তী সুয়াপুর সংলগ্ন রোউয়া গ্রামে আব্দুল জব্বর মিয়ার বাড়ীর কাছে ভূনিম্নে দুইটি বৃহদাকৃতি জালা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা কড়িতে পূর্ণ ছিল; সেই কড়িগুলি এত প্রাচীন, যে তাহা ধরিলেই ছাইয়ের মত চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেখানে অনেক

মাটীর খেলনা ও অপরাপর পুরাতন ভাঙ্গা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি, এই গ্রামে মাঝে মাঝে প্রাচীন মুদ্রাও পাওয়া যাইত।

রজনী চক্রবর্ত্তীর "গৌড়ের ইতিহাসে" সুয়াপুর গ্রামে যে এককালে রাজধানী ছিল তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ধামরাই, সাভার, সুয়াপুর, বাজাসন ও রোউয়া প্রভৃতি গ্রাম লইয়া যে বৃহৎ ভূখণ্ড ঢাকার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত, তাহাতে অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ আছে। দুঃখের বিষয় ইহার কোন যথোচিত অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। এই অঞ্চলের আরও কয়েক মাইল পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ দাসরা গ্রাম। সম্ভবতঃ টলমির মানচিত্রে এই গ্রামও নিকটবর্ত্তী বানিয়াজুরী (বেনুয়াজুরম্) পল্লীর উল্লেখ আছে। দাসরা গ্রামে গুপ্ত রাজত্বকালের একটি ভগ্ন প্রস্তর স্তম্ভ মাটীর বহু নিম্নে পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল উপকরণ স্বপ্নবৎ আমার মানস চক্ষের সামনে রাখিয়া কল্পনার ঘোড়দৌড় চালাইয়া আমি এই গল্পটি রচনা করিয়াছি। আমার প্রধান লক্ষ্য কোন ঐতিহাসিক প্রশ্নের সমাধান নহে। কিন্তু কেন যে পূর্ব্ব বঙ্গের এক বৃহৎ সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দু-সম্প্রদায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার সামাজিক কারণ নির্দ্ধারণ করা। সে চেষ্টায় আমি কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছি—তাহার বিচারক আমি নহি।

হিন্দু-শাসনের শেষ সময়ে সমাজ-গুরুগণের নির্দ্দেশে এই সমাজের অনেক বর্ণ পূর্ব্ব গৌরব-বিচ্যুত হইয়া হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৈবর্ত্তগণ পূর্ব্বকালে সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দিব্বোক, রুদোক, ভীম প্রভৃতি গৌরাধিপেরা বরেন্দ্র মণ্ডলে শৌর্য্য-বীর্য্য ও বিদ্যা-বুদ্ধির

জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন। এখন এই বিশাল জাতির নব জাগরণ লক্ষিত হইতেছে এবং ইঁহারা পূর্ব্ব গৌরবান্বিত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার সঙ্কল্প করিয়া নিজদিগকে 'মাহিষ্য' নামে পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইঁহারা কৈবর্ত্ত নামেই পরিচিত ছিলেন, এজন্য আমি বাধ্য হইয়া সেই নামই ব্যবহার করিয়াছি। হিন্দু স্মৃতিকারগণের কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সমস্ত বর্ণকেই—এমন কি ক্ষত্রিয়দিগকেও শূদ্র বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। আমি গ্রন্থভাগে ১৪৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি যে, চণ্ডাল ও নমঃশূদ্র দুই পৃথক শ্রেণী।—শাস্ত্রোক্ত চণ্ডাল জাতি এখন আর বঙ্গদেশে নাই। তাহারা সামাজিক অত্যাচারে ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত লিখিতেছি—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি, মহাশয় এই পুস্তকের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার মুক্তহস্ত দানের স্রোত অবাধ। তিনি তাঁহার নামে এই পুস্তক উৎসর্গ করিতে অনুমতি দিয়া আমার ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়াছেন।

পুস্তকের প্রচ্ছদ-পটটি শিল্পী শ্রীযুক্ত আশু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিকল্পনা ও অঙ্কন করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমি নানা বিষয়ে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী মহাশয়ের উপদেশ ও প্রুফ সংশোধনাদি ব্যাপারে সাহায্য পাইয়াছি। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন,

বেহালা।

শ্যামল—শৈবাল রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হংসরাজের ধর্ম্ম-পুত্র।

রাজগুরু—গর্গ (কনোজ-বাসী)

অপর রাজ্যটির নাম সাভার, সাভার ও তদুত্তরে স্থিত বিস্তৃত কিরাত রাজ্য ও ভাওয়াল লইয়া সাভার রাজ্যের সীমানা।

এই দুই রাজ্যের মধ্য দিয়া ধলেশ্বরী নদী প্রবাহিতা। গল্প-বর্ণিত সময়ে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তথাকার রাজা ছিলেন—মহেন্দ্র সেন। ইনি মহারাজ ভীমসেনের বংশধর। যদিও ইনি বাজাসনাধিপ দুর্জ্জয় সেনের জ্ঞাতি, কিন্তু সাভারের রাজারা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করাতে ইঁহারা হিন্দু সমাজের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সাভারের রাজা মহেন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ বিমলেন্দু অল্প বয়সে যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর কনিষ্ঠ কুমার বিশ্বনাথই রাজত্বের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও অল্প বয়সে অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সাভারের রাজমন্ত্রী বজ্রধ্বজই শেষ সময়ে একরূপ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়েন।

গল্পোক্ত এই প্রদেশের প্রধান চরিত্রগণ :—

মহারাজ—মহেন্দ্র সেন,

জ্যেষ্ঠ কুমার—বিমলেন্দু (অল্প বয়সে নিহত)

কনিষ্ঠ কুমার—বিশ্বনাথ (ঐ)

জ্যেষ্ঠ কুমারের পত্নী—স্বর্ণমঞ্জরী

রাজমন্ত্রী—বজ্রধ্বজ

ধর্ম্মগুরু—শান্তাচার্য্য।

রাজমন্ত্রী বজ্রধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যার নাম কজ্জলিকা ও তাঁহার সহচরীর নাম কিশোরিকা।

ইহা ছাড়া সিঙ্গুরের (সিংহপুরের) মঠের অধ্যক্ষ স্থবিরানন্দ ("সব-দেওয়া-বাবা" নামে বাজাসন অঞ্চলে পরিচিত) এবং বাজাসনের প্রধান ব্যায়াম-বীর ও সৈনিক ভীমমল্ল, উল্কারায় প্রভৃতি চরিত্রও গল্প-ভাগে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্যামল ও কজ্জল

এক

"কুঞ্জের দ্বারে ও কে দাঁড়ায়ে ?
ও কি বারিধর, কি গিরিধর,
নাকি নবীন মেঘের উদয় হ'ল ?"

—কৃষ্ণকমল।

[খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ঢাকা নগরীর উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত নান্নার গ্রাম-সংলগ্ন বাজাসন বিহার বৌদ্ধাধিকারে একটি প্রধান বিদ্যা-কেন্দ্র ছিল। এই বিহারের অনতিদূরে, পশ্চিম দিকে সুয়াপুরী গ্রাম। আমরা যে সময়ের কথা লইয়া এই আখ্যায়িকা লিখিতেছি, তাহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। তখন চন্দ্রবংশীয় বৈশ্বানর গোত্রের রাজারা বাজাসন-অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন।]

আজ মহারাজ দুর্জ্জয় সেনের দরবারে একটি চণ্ডাল-বালক আসিয়াছে। তাহার বয়স ১৯।২০। তাহার চেহারার মধ্যে বেশ একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গলার শ্যাম প্রাকৃতিক দৃশ্যে যে একটা স্নিগ্ধ আভা দেখা যায়, বালকের বর্ণে তেমনই শ্যাম-নীলিমার খেলা,—চক্ষুর তৃপ্তিপদ, লাবণ্যের খনি। তাহার নাসিকা

উন্নত ও কপাল প্রশস্ত ; এক বাহুতে মণি-খচিত স্বর্ণময় বাজুবন্ধ, অপর হস্তে একটি বর্শা। সদ্য বর্ষাস্নাত, সবুজ পত্র-মণ্ডিত একটি তরুণ পুষ্প-তরুর ন্যায় তাহার সেই রূপে রূঢ়তার লেশ মাত্র নাই। একি চণ্ডাল পুত্র ? রাজপুত্রের ন্যায় ইহার অঙ্গ-প্রতঙ্গের মহিমা, দেখিলেই সম্ভ্রমের ভাব মনে হয়,—একটি অর্দ্ধস্ফুট কুবলয়ের ন্যায় তরুণ যুবকের স্নিগ্ধ কান্তি।

বৃদ্ধ সেনাপতি শৈবাল রায় রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, আমার বড় ভাই হংসরাজ ১৬ বৎসর পূর্ব্বে সস্ত্রীক দেশান্তরী হ'ন। সামান্য কথায় তাঁহার মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। রাজবংশী স্বরূপ সিং প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিবেশী হয়তঃ এই বিদ্বেষে ইন্ধন জোগাইতেছিল। আমার বড় ভায়ের দোষ ছিল—অনেক সময় তিনি মনের ভাব চাপিয়া রাখিতেন। তাঁহার বিমর্ষভাব দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাইতাম ; তিনি প্রকাশ্যভাবে কিছুতেই আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেন না, কিন্তু তখন হইতে সময়ে সময়ে প্রায়ই অকারণে অপ্রসন্ন থাকিতেন। এজন্য আমি অনুতপ্ত ছিলাম। আমার বউঠাকুরাণী, যিনি মাতৃবিয়োগের পর শৈশবে আমাকে লালনপালন করিয়াছিলেন, তিনিও যেন দাদার সঙ্গে আমার পর হইয়া গেলেন! আমার দাদা ও বউঠাকুরাণীর এই ভাব দেখিয়া আমার সংসারের প্রতি আকর্ষণ শিথিল হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া তিনি নিরুদ্দিষ্ট হইয়া গেলেন। চিঠিতে লেখা ছিল—"আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইব, আর দেশে ফিরিব না। তুমি

আমাকে বৃথা খুঁজিয়া হয়রাণ হইও না, আমাকে আর পাইবে না। তোমার বউদিদি আমার সঙ্গেই চলিলেন। তোমার বউদিদি ত আজ কয়েক দিন ধরিয়া কেবলই চোখের জল মুছিতেছেন। তাঁহার আঁচলের কোণ চিরদিনই ভিজা থাকিবে, উহা শুকাইবে না। সুয়াপুরের আকাশ, বাজাসন, কানাই নদ, মলঙ্গার বিল ও মল্লভূমি রোউয়া আমার মনে যে ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে, তাহা বুঝি মৃত্যুর পরেও আমার বুক চিরিলে অঙ্কিত দেখা যাইবে। তুমি সুখে থাক, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। গুরুজনের প্রাণে মায়ামমতার স্থলে কতটা দাগা পড়ে, তাহা বুঝিয়া দরকার নাই ; সে দাগ আমার ঘুচিবার নহে।" এই চিঠি পাইয়া আমি পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলাম। মহারাজ আমার মনে শান্তি দেওয়ার জন্য কত কি-ই না করিয়াছেন! সে সকল কথা অবশ্যই আপনার মনে আছে। উত্তরে কিরাত-ভূমি, নেপাল উপত্যকার ঘন অরণ্য, ভোটদেশের নিবিড় পাহাড়িয়া জঙ্গল, হাজাং জাতির নিবাসস্থল, ও উত্তরে গৌড় ও মিথিলা, সরযূ নদীর তীর, অযোধ্যা, এমন কি তমসা নদীর কূল ও কণোজের রাজধানী, বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উপত্যকায় রেবা ও গোদাবরীর তীরবর্ত্তী সুবিস্তৃত জনপদে মহারাজের নিয়োগে বহু লোক নানাভাবে সন্ধান করিয়াও আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর কোন খোঁজখবর পায় নাই।

"এই ১৫।১৬ বৎসর আমি যেভাবে জীবন যাপন করিয়াছি, তাহা আর কি বলিব? যেখানে কোন সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াছি,

তাঁহাকে কত ভক্তি-প্রণতিপূর্ব্বক প্রশ্ন করিয়াছি, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারেন নাই। আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে আমার পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মাতৃসমা বউদিদির মনে কষ্ট দিয়া তাঁহাদিগকে দেশছাড়া করিয়াছি! এই অনুশোচনায় সর্ব্বদা দগ্ধ হইয়াছি। কোনও যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছি, রণক্ষেত্র যেন এই ভ্রাতৃদ্বেষীর রক্তে রঞ্জিত হয়, আর যেন ঘরে ফিরিয়া না আসি।"

"মহারাজ, চার পাঁচ দিন হইল এক সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি এই তরুণ বালককে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলেন,—"সেনাপতি মহাশয়, এই বালককে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রবৎ পালন করিয়া নানা স্থানে যুদ্ধ-কৌশল ও রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও বালকটিকে চোখে হারাইতেন। কিছুদিন হইল আপনার ভাই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আমরা উভয়ে এক নাগা সন্ন্যাসীর শিষ্য ছিলাম, সুতরাং তিনি আমার গুরুভাই ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে এই তরুণ যুবককে আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ বাজাসনের নিকট সুয়াপুর গ্রামে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছেন। তিনি না থাকিলেও তাঁহার স্বগণ ও অন্তরঙ্গেরা আছেন। আপনি এই বালককে তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করিয়া বলিবেন, তাঁহারা যেন ইহাকে পুত্রবৎ ব্যবহার করেন, ইহাকে কোনরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করেন। গুরুদেব বলিয়াছেন, এই বালক অসাধারণ প্রতিভা-

সম্পন্ন। আমি আপনাকে ইহার অভিভাবক জানিয়া ইহার ভার আপনার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গেলাম।” আমার কোন প্রশ্নের একটিরও তিনি উত্তর দিলেন না। আমার শত অনুরোধ ও আতিথ্য উপেক্ষা করিয়া তিনি সন্ধ্যার আঁধারে তেলেঙ্গার পথ ধরিয়া, জীয়স পুকুরের পশ্চিম পার অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। এই বালক মহারাজের দাস, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র; সুতরাং এই ছেলে আমার উত্তরাধিকারী ও সর্ব্ব সম্পত্তির মালিক। শুনিয়াছি, এ ছেলে যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ এবং সর্ব্ববিষয়ে কৃতী। আপনি ইহাকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করুন।”

রাজা—“তুমি যখন ইহাকে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তখন এ সম্বন্ধে আমার দ্বিধার কোন কারণ থাকিতে পারে না। বালক, তোমার পিতা তোমাকে কত দিন লালন-পালন করিয়াছেন ?”

বালক করজোড়ে পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিল—“আমার বয়স যখন দুই বৎসর, তখন হইতে আমি হংসরাজের পুত্রস্বরূপ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—আমার খুল্লতাত শৈবাল রায় একদিন তাঁহার অসাক্ষ্যাতে বলিয়াছিলন—‘দাদা যুদ্ধবিগ্রহাদি কিছুই করিবেন না, যুদ্ধ করা নাকি মহাপাপ ! যদি যুদ্ধ মহাপাপই হয়, তবে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি তিনি ভোগ করিবেন কিরূপে ? এই বাড়ীর পাপদুষ্ট অন্নব্যঞ্জন না খাইয়া আশ্রমে যাইয়া তাঁহার লতাপাতা ভক্ষণ করাই উচিত।’ এই কথা নাকি

তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। তদবধি তিনি ও তাঁহার স্ত্রী, যিনি আমাকে লালনপালন করিয়াছিলেন, যে দুই এক মাস এই বাড়ীতে ছিলেন, এখানকার এক গণ্ডুষ জলও পান করেন নাই। কোন দিন উপবাস, কোন দিন ফলমূল ও শাকসব্জী খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছেন। খুল্লতাত মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষুণ্ণ হইবার বিশেষ কারণ ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ইনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। যাঁহার মনোবৃত্তি অহিংসামূলক, হিংসার অর্জ্জিত দ্রব্য ভোগ করা তাঁহার পক্ষে অপরাধ।

"তিনি আমাকে কয়েক জন নাগা ও কিরাতদের হাতে যুদ্ধ-বিদ্যা শিখিবার ভার দিয়াছিলেন। কারণ, তিনি নিজে যদিও যুদ্ধ কলহাদিতে বিমুখ ছিলেন, তথাপি তিনি মনে করিতেন, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের জীবন-পন্থাই আমার হইবে। সুতরাং তিনি তাঁহার নিজ মনের বিরাগ দিয়া আমাকে গড়িতে চান নাই। তিনি আমার জন্য আমাদের পরিবার ও বংশের ধারা সর্ব্বতোভাবে বজায় রাখিবার উপযোগী শিক্ষারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতার ন্যায়ই স্নেহশীল ছিলেন। মাতার কাছে আমি যে আদর, স্নেহ ও যত্ন পাইয়াছি, তাহা আর কি বলিব! আমি তাঁহাদের ঋণ শোধ করিতে পারিব না। তবে তাঁহার শিক্ষামত মহারাজের ও খুল্লতাত মহাশয়ের আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিয়া যদি তনুপাত করিতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক হইবে বলিয়া মনে করি।"

যুবকের কথায় শৈবাল রায়ের মনের একটা যবনিকা যেন মুক্ত হইয়া গেল। তাঁহার বড় ভাই যে সংসারের প্রতি কেন বিরূপ হইযাছিলেন, তাহার সমাধান করিতে যাইয়া তিনি কত ভাবিয়াছেন! স্বরূপ সিং প্রভৃতি বন্ধুদিগকে মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছেন! আজ সে সকল ভাবনার ও সন্দেহের অবসান হইল।

রাজা বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি সেনাপতির গৃহে বাস কর।" মন্ত্রীকে ডাকিয়া রাজা আদেশ করিলেন,—"কানাই নদের অপর পারে ইরতা ও আটিগ্রাম, এই দুইটি সমৃদ্ধ পল্লী যুবককে দেওয়া হোক। তৎসঙ্গে ধলেশ্বরীর মধ্যে যে দুই ক্রোশ দীর্ঘ চরাভূমি উঠিয়াছে, ও পার্শ্বে নদী অন্য দিকে বহমান রহিয়াছে, সেই 'ব' দ্বীপাকৃতি ভূমিখণ্ডে চাষাদিগকে উপনিবিষ্ট করিয়া তাহাও যেন বালকের নামে লেখাপড়া করিয়া দেওয়া হয়।"

দুই

"নয় দেউড়ী পার হ'য়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন'পরে ॥
রাজার সভাখান যেন দেব-অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
চারি দিকে নৃত্যগীতি সর্ব্বলোকে হাসে।
চারিদিকে ধাওয়া ধাই রাজার আবাসে ॥

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরী।
তার উপরে পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ী॥
নানামতে শ্লোক আমি পড়িলাম রসাল।
খুসী হৈয়া রাজা মোরে দিলা পুষ্পমাল॥"

—কৃত্তিবাস।

"অশ্বপৃষ্ঠ তল দিয়া লইয়া চাবুক।
অন্যদিক দিয়া উঠে দেখায় কৌতুক॥
চতুর্দ্দিকে পাক লৈলা লাটিকা আকার।
চিনিতে না পারে কেহ অশ্ব আসোয়ার॥"

—আলওয়াল

আজ সুয়াপুরের চড়ক-খেলার মাঠে বিপুল জনতা। অদূরে বহু স্তম্ভ-শোভিত শ্বেত শতদলের মত বাজাসন বিহারের অভ্রংলিহ চূড়া দেখা যাইতেছে। চড়কখেলার মাঠের পশ্চিমে একটি নাতি-বৃহৎ দীঘি, কাক-চক্ষুর ন্যায় তাহার গাঢ় নীলাভ জল। সেই কৃষ্ণবর্ণ সলিলে শরৎকালের শুভ্র মেঘের ন্যায় ক্রীড়মান হাঁসগুলির সাদা পাখা সৌর কিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। অদূরে বেনেদের ফুলের বাগানের সুরভি সেই দীঘির জল-সম্পৃক্ত হইয়া চৈত্রমাসের দারুণ উত্তাপের জ্বালা যেন জুড়াইয়া দিতেছে। দীঘির দক্ষিণ দিক ব্যাপিয়া প্রকাণ্ড ক্রীড়াভূমি, তাহার উপর পট্টবস্ত্র-নির্ম্মিত সুবৃহৎ চাঁদোয়া। সহস্র সহস্র লোকের ভিড়; সেই খেলার মাঠে বালক শ্যামল ঘোড়দৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৃতিত্ব দেখাইবে।

রাজা স্বয়ং একখানি ব্যাঘ্রাকৃতি স্বর্ণ-সিংহাসনের কাছে দাঁড়াইয়া; তিনি তাহাতে উপবেশন করেন নাই, তাঁহার হস্তে বড় হীরক-মণ্ডিত একখানি নাতিদীর্ঘ রাজদণ্ড। তাঁহার দেহ নগ্ন, ক্রম-বর্দ্ধমান মুক্তার হার তাঁহার কণ্ঠে তিন চার লহরীতে বিরাজিত। তাঁহার গোঁফ শুভ্র, দুই দিকে দুইটি ক্ষুদ্র বকের মত তাহাদের শুভ্র মহিমা বিকাশ করিয়া দেখাইতেছে। তাঁহার মাথায় একটি শুভ্র টোপর, তাহার উপর কঙ্ক পাখীর শুভ্র পালক। সেই পালকের নীচে যে একখানি প্রকাণ্ড হীরক সূর্য্য-কিরণে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যেন হোমানলের শুভ্র দীপ্তি বিকীর্ণ করিতেছে। এই শিরস্ত্রাণের পার্শ্বে চুলগুলি বক্রান্ত ও কুঞ্চিত এবং একেবারে সাদা। মনে হয় যেন একখানি শ্বেত মর্ম্মরের বিগ্রহ, তেমনি স্থির, গম্ভীর, তেমনি অপলক দৃষ্টি, মহিমার শুভ্র একখানি মুকুর-সদৃশ। রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন মন্ত্রী সমুদ্র সেন। উভয়ে সমবয়স্ক; সমুদ্র সেনের নাসিকা একখানি শানিত তরবারির ন্যায়, প্রখর প্রতিভা-ব্যঞ্জক। কিন্তু তিনি রাজার মত ঠিক ঋজু নহেন, বয়সের আধিক্যে মেরুদণ্ড ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছে। তিনি রাজার মত একেবারে বিরলদন্ত নহেন; শ্বেত মৌক্তিকের মধ্যে মধ্যে রক্ত দাড়িম্ব বীজের মত তাঁহার নৈসর্গিক দন্তগুলির মধ্যে কৃত্রিম স্বর্ণদন্ত অবকাশ পূর্ণ করিতেছে। ঈষৎ ন্যুব্জ দেহে সামর্থ্যের অভাব নাই। বামহস্তে যে দীর্ঘ তরবারি তিনি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছেন, তাহা এখনও যেন রণক্ষেত্রে শত্রুশোনিত লোলুপ।

শ্যামল ও কজ্জল

রাজার দক্ষিণে ঋষিতুল্য, কৌপীন্‌বাস-পরিহিত, দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতকপাল ধর্ম্মাধিকরণ ঈশান ভাদুড়ী। তাঁহার সমস্ত দেহ হইতে ঋষিজনোচিত তেজ বিচ্ছুরিত; রাত্রি-জাগরণ ও তপস্যার কৃচ্ছ্র তাঁহার দেহকে কৃশ করিয়াছে। এই পুণ্যবান্‌ ধর্ম্মাধিকরণের ক্ষীণাঙ্গ অবলম্বন করিয়া যেন এই কলিকালে এক পাদ ধর্ম্ম সেই রাজ্যে অবস্থান করিতেছেন। রাজার আশ্রিত ছোট ছোট রাজা ও জমিদারেরা মহারাজ দুর্জ্জয় সেনের দক্ষিণে সম্ভ্রমের সহিত দাঁড়াইয়া আছেন। অপর দিকে ধনকুবের বণিককুল নানা মূল্যবান্‌ প্রস্তরের অঙ্গুরী ধারণ করিয়া শ্বেত, রক্ত ও পীত, বিবিধ বর্ণের মস্‌লিনের অঙ্গরক্ষা ও ধুতি পরিয়া এই বিচিত্র দরবার-শিবিরে বহুমূল্য আভরণের চাকচিক্যে দর্শক-মণ্ডলীকে কৌতূহলাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। রাজার এক পার্শ্বে মণিময় পুষ্পাধার ধারণ করিয়া এক সুন্দরী বিদেশিনী সেই শিবির-স্থিত মণ্ডপের হাওয়া সুবাসিত করিতেছেন; অপর দিকে তাম্বূল ও চন্দন ধারিণী যুবতীরা নানা আভরণে ভূষিতা হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা অদ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে জয়ী হইবেন, রাজা স্বয়ং তাঁহাদিগকে পান ও চন্দন দিয়া প্রসাদ বিতরণ করিবেন। সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক বিচিত্র পরিচ্ছদধারিণী রমণী রাজার সম্মুখে চামর দোলাইতেছেন। চামরের আবর্ত্তন-কালে সেই রমণীর মণিময় কাঁকণ বাজিয়া উঠিতেছে এবং তাহার করশোভী মণিময় চুড়িতে প্রদীপ্ত সূর্য্য-কিরণ পড়িয়া চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে।

রাজসিংহাসন হইতে প্রায় ৮০ হাত দূরে শৈবাল রায় নত মুখে রাজাদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি চণ্ডাল জাতীয়। পূর্ব্বে রাজসিংহাসন হইতে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান মাত্র ২০ হাত ব্যবধানে ছিল। এখন নবাগত গোঁড়া ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবধান বাড়িয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এখন আর প্রায় দরবারে ঢুকিতেই পায় না। পূর্ব্বে রাজা প্রাতঃকৃত্য ও পূজা-আহ্নিকাদি সমাধা করিয়া রাজপ্রাসাদের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেন, রাজধানীর সমস্ত প্রজা নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজদর্শন পাইত। এখন কণোজিয়া ঠাকুরদের নূতন বিধি-ব্যবস্থায় নিম্নশ্রেণীর সে সকল সুবিধা অন্তর্হিত হইয়াছে। তেলীর মুখ, ধোপার মুখ শ্মশ্রুহীন মুখ প্রভৃতি দর্শন করা পাপ। নানারূপ সংস্কৃত শ্লোক-রচিত বিধি-ব্যবস্থার কণ্টকাকীর্ণ বাধা নিম্নশ্রেণীকে এরূপ জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে যে, দরবারে তাহাদের কোন স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং যে রাজাদের জন্য তাহারা অবাধে প্রাণের রক্ত ঢালিয়া দিয়া, যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাদের সেবায় সমর্পণ করিয়া, নির্ভয় ও অকুণ্ঠচিত্তে যুদ্ধবিদ্যার সাধনা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাদের সঙ্গে সিংহাসনের সে সম্পর্ক যেন টুটিয়া গিয়াছে। এই জন্য আজ তাহারা নিতান্ত অপরাধীর মত অবসন্ন। অজ্ঞাত পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফলে যে তাহারা হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং শত সহস্র জীবন যে সেই জন্ম-জন্মান্তর কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাদের জাতি-বৈষম্যের গণ্ডি হইতে ত্রাণ পাইতে হইবে, এই ধারণা

বদ্ধমূল করাইবার চেষ্টা হইতেছে। তাহাদিগকে এ জীবন পশুবৎ কাটাইতে হইবে, ভবিষ্যতে কোন জন্মে হয়ত তাহাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইতে পারে, এই সুদূরপরাহত ক্ষীণ আশাই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। বীর্য্যে ও বিক্রমে অতুলনীয়, সংখ্যায় বিপুল, দৈহিক বলে অসাধারণ বলিষ্ঠ, প্রভুভক্ত চণ্ডাল জাতি বিক্ষুব্ধ জলধির উত্তাল তরঙ্গের মত আজ চঞ্চল। তাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোকের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তথাপি তাহাদের পা ছোঁয়ার অধিকার পর্য্যন্ত নাই। এই নিয়তি তাহারা ক্ষোভের সহিত মানিয়া লইয়াছে ; কিন্তু সেনাপতির অপমানে তাহারা প্রকৃতই ব্যথিত।

শৈবাল রায় দীঘলছিটের স্বাধীন রাজা প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের বংশধর। কত যুদ্ধে মহারাজ দুর্জ্জয় সেনের গৌরব-রক্ষার জন্য ইনি নিজেকে কামানের মুখে সমর্পণ করিতে গিয়াছেন, শত্রুকৃত বিন্দুমাত্র অপমানে যিনি খড়্গাঘাতে স্পর্দ্ধিত বীরশ্রেষ্ঠদের শির দেহচ্যুত করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে প্রস্তুত, তাঁহার নিজ রাজদরবারে এই সম্মানের বিলোপ তিনি মেষ-শাবকের ন্যায় সহ্য করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার স্বগণ ও বন্ধুরা এই অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেছে না। রাজা স্বয়ং ব্রাহ্মণদের বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় দিতে দ্বিধা বোধ করিয়াও প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেছেন না। তাঁহারা যে ভূদেব,—তাঁহাদের শাস্ত্র যে অভ্রান্ত! আজকার রাজদরবারে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যেন খুব আন্তরিকতার সহিত যোগ দিতে পারিতেছে না, কোথায় যেন তাহাদের বাধিয়াছে। তাহারা শুনিয়াছে, বরাবর যে সকল পল্লীগান

দরবারে গীত হয়, এবার তাহা হইবে না। কণোজিয়া ঠাকুরেরা বাঙ্গলা জানেন না ; তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এ দেশের ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে যাওয়া পাপ। যাহারা সে চেষ্টা পায়, তাহারা নরকে যায় : বাঙ্গলা ভাষা পৈশাচিক প্রাকৃত,—উহা একেবারে অপাংক্তেয়। যাহারা সারা রাত্রি জাগিয়া লম্ফঝম্প ও বাদ্যযন্ত্রের উচ্চরোলের সঙ্গে পরম উল্লাসে গানগুলি সারা বৎসর ভরিয়া শিখিয়াছিল, তাহারা যখন শুনিল, রাজা আর তাহাদের গান শুনিবেন না, তখন তাহারা যেন মুষ্‌ড়িয়া গেল ; গৃহহারা, সমাজহারার ন্যায় পল্লীর লোকেরা নিজের গৃহে অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিল। মনে হইল, যাহা এতদিন এক ছিল, তাহা যেন কে বা কাহারা শতখণ্ডে ভাগ করিয়া তাহাদের প্রাণে যে দাগা দিয়াছে, তাহা কোন কালেই সারিবে না,—এই বিষ সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িয়া অনর্থ উৎপাদন করিবে।

বালক শ্যামলের জেদ, সে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীর সঙ্গে ঘোড়ার খেলায় প্রতিযোগিতা করিবে। ভীমমল্ল প্রথমে ঘোড়-দৌড় দেখাইল। তাহার নামের মতই দেহ এবং তাহার দেহ ছাপাইয়া উঠিয়াছে বেগবান্, স্থূলকায় অশ্বের শরীর। কালো রঙ্গের ঘোড়াটি, মোষের মত রক্তবর্ণ চক্ষু, লেজ চামরের ন্যায়। এক কৃষ্ণবর্ণেরই কত সূক্ষ্মভেদ তাহার দেহে খেলিয়া যাইতেছে! কেশরগুলি সিংহের মত গুচ্ছে গুচ্ছে বিন্যস্ত, সেগুলি মিশ্‌ কালো। সেই কালোর উপর নীলের আভা ছড়াইয়া দিয়া যেন বিধাতাপুরুষ

তাহার দেহের বর্ণ সাজাইয়াছেন। লেজের নীল বর্ণে যেন সবুজের আভা খেলিতেছে। কালো, নীল, সবুজ যেন একত্র গুলিয়া কোথাও কালোকে ঘনীভূত করা হইয়াছে, কোথাও তাহার উপর তরল সবুজ, কোথাও বা নীলের আভা, যেন উক্ত ত্রিবর্ণের অতি মস্‌ণ ঢেউ-খেলানো একখানি পারস্যদেশের গালিচা। এই বর্ণ ত্রয়ে রামধনুর মত সাত রঙের খেলা নাই। তিনটি বর্ণেরই এরূপ সূক্ষ্ম সমারোহ যে, কোথা হইতে গাঢ় নীল বা কালো আরম্ভ হইয়াছে, কোথা হইতে সবুজের আভা সুরু হইয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অথচ দ্রুত ধাবনের কালে মনে হয়, যেন কালো, সবুজ ও নীলবর্ণের অপূর্ব্ব তরঙ্গ চোখের সামনে ভাসিয়া যাইতেছে। ঘোড়ার খুরগুলি শাণিত তরবারির মত উজ্জ্বল, কাণদু'টি শিকারী কুকুরের মত উর্দ্ধগ। তাহার চারি হাঁটুর উপর কাশ্মিরী শালের বেষ্টনী। যখন খেলার মাঠে ভীমমল্ল এই অপূর্ব্বদর্শন ঘোড়ায় চড়িয়া উপস্থিত হইল, ঘোড়া একবার 'চিঁহিঁ' করিয়া ডাকিয়া উঠিল, মনে হইল তারে বাঁধা রৌপ্য ঘণ্টাগুলি বাজিয়া উঠিয়াছে। ঘোড়ার নাম 'তুফান', কি অদ্ভুত দৌড়! ঘোড়া সোয়ারকে লইয়া যেন অবলীলা-ক্রমে সমুদ্রে সাঁতার কাটিতেছে, কিংবা বাজের মত আকাশে উড়িতেছে, অথবা অপ্সরার মত রঙ্গমঞ্চে নাচিতেছে। যেমন ঘোড়া, তাহার তেমনই সোয়ার। অয়স্কান্তি মণিমণ্ডিত লাগাম অশ্বের অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-ভাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া যেন বিদ্যুতের খেলা দেখাইতেছে, তাহার পরিচালনাগুণে অশ্বটি নানা ছন্দে দ্রুত খুর-ক্ষেপের

কায়দা দেখাইতেছে, আর অমনি সহস্র সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি তুমুলভাবে উত্থিত হইতেছে। ভীমমল্ল সেই দ্রুতধাবিত, অতিশয় ক্ষিপ্র অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তাহার দক্ষিণ হস্তধৃত অসি ঊর্দ্ধে ফেলিয়া তাহা মাটিতে পড়িতে না পড়িতেই আকাশ পথ হইতে ধরিয়া ফেলিতেছে, অথচ ঘোড়ার গতির ক্ষিপ্রতা এক বিন্দুও হ্রাস পাইতেছে না। ঘোড়া যখন 'ধাপে' ছুটিতেছে, তখন মনে হইতেছে যেন একখানি ডিঙ্গা উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ডুবিতে ডুবিতে নিজেকে সামলাইয়া লইতেছে; সেই গতি ভাল তীরন্দাজের তীরের গতিকে ছাপাইয়া চলিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে ঘোড়া যেন মাটিতে পড়িয়া লুটাপুটি খাইবে, এই আশঙ্কা জন্মাইয়া দক্ষ সোয়ারের লাগামের কায়দায় পুনরায় উঠিয়া পড়িয়া চলিতেছে। একি চোখের ধাঁধা, না জীবন্ত বিস্ময়! যেন এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ তীব্র সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় নেত্র উন্মীলন করিয়া ঈশান কোণের হাড়িয়া ঝাপটায় পাগলের মত গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় আকাশে ছুটিয়াছে। 'ধাপের' পরে 'কদম'। তখন খুরের শব্দ উৎকৃষ্ট তবলচীর গুরুগম্ভীর বাদ্য-যন্ত্রের শব্দের সঙ্গে যেন তাল রক্ষা করিয়া নৃত্য-পাগ্‌লী কিন্নরীর মত ছুটিয়াছে। যেমন সোয়ার, তেমনই ঘোড়া, উভয়ের জোড়া এই বাজাসন ভিন্ন কোথায় মিলিবে?

ঘন ঘন জয়-ধ্বনির মধ্যে বিচিত্র কৌশল দেখাইয়া অশ্বারোহী অশ্বের গতি থামাইয়া মহারাজকে অভিবাদন পূর্ব্বক দাঁড়াইল। পুনর্ব্বার "জয় ভীমমল্লের জয়", "জয় মহারাজের জয়" শব্দে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শ্যামল মহারাজকে অভিবাদন করিয়া, খুল্লতাতকে প্রণামপূর্ব্বক মন্দুরা হইতে আনীত বহু অশ্বের মধ্য হইতে তাহার নিজের "রণজয়" নামক ঘোড়াটিকে বাছিয়া লইল। ঘোড়ার বর্ণে বৈচিত্র্য বা বাহ্য শোভা বিশেষ কিছুই নাই। পা চারিটি স্বাভাবিক অপেক্ষা একটু বেশী লম্বা, দেহ কর্ম্মঠ, দীর্ঘ ও বেগশালী, পুচ্ছটি মালীর হাতে ছাঁটা পুষ্প-তরুর মত একটা গুচ্ছের আকৃতি, চোখ হইতে তীব্র জ্বালা ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। সমস্ত দেহ সাদা, কেবল ঘাড়ের পাশে জেব্রার মত ছাই রঙের ডোরা ; উহার বিশেষত্ব কিছুই নাই। কিন্তু শ্যামল তাহার গায়ে হাত দিতেই সে যেন তাহার সোয়ারকে চিনিয়া আহ্লাদে ডাকিয়া উঠিল, পৃষ্ঠদেশে ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইল ; সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। "এসে' বসুন," ঘোড়াটি যেন এই আবেদন জানাইতেছে। ঘোড়ার উপর যে মূল্যবান জিন্ ছিল, শ্যামলের ইচ্ছাক্রমে তাহা বদ্‌লাইয়া সাধারণ একটা আঁটো-সাটো মাটির রঙের জিন তাহাকে পরান হইল।

শ্যামল যখন লাফ দিয়া ঘোড়ার উপর উঠিয়া বসিল, তখন তাহার চেহারা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এ কোন্ যাদুকর 'দোগাম্' খেলা দেখাইতে আসিয়াছে! ঘোড়ার খুর যে মাটি ছুঁইয়াছে, তাহা ত মনে হইতেছে না! চারিদিকে তিন হাত বেড়ার গণ্ডি ; সেই গণ্ডি অতিক্রম করিবার নিয়ম নাই। কিন্তু শ্যামল মুহুর্ম্মুহুঃ মাটি না ছুঁইয়া, বেড়ার বাঁশ স্পর্শ না করিয়া শূন্যপথে সেই গণ্ডি অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া সেই গণ্ডির মধ্যে আসিতেছে, যেন অদৃশ্য হস্তে একখানি তরবারি খেলিতেছে, যেন বর্ষার আকাশে

বিজলী চমকাইতেছে। প্রথম হইতেই দর্শকেরা বুঝিল, এই সোয়ারের খেলা অদ্ভুত। এ পর্য্যন্ত তাহারা যে ঘোড়-দৌড় ও খেলা দেখিয়াছে, ইহা সেই শ্রেণীর নহে। ভীমমল্লের খেলা হইতেও ভাল, এই কথা তাহাদের ওষ্ঠ-প্রান্তে আসিয়াও যেন ফুটিতেছে না। কারণ একথা অভূতপূর্ব্ব, অনভ্যস্ত। ভীমমল্লের খেলায় সাজ-সজ্জা ও বর্ণ-বৈচিত্র্য যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তরুণ সোয়ারীর খেলায় তাহা নাই, তাহাকে দেখা যায় না; যেন একখানি হস্ত ও একখানি অসি। সেই অদৃশ্য হস্তের প্রেরণায় অস্ত্রখানি শুধু ঝিলিক মারিতেছে। 'দোগাম্' খেলায় ক্ষণে আকাশে, ক্ষণে বায়ুপথে, ক্ষণে ধরণী-পৃষ্ঠে একটা কি যেন ক্ষিপ্রতা সহসা গোচরীভূত হইয়া যাদুকরের মোহিনী প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অশ্ব বুঝা যায় না, সোয়ার বুঝা যায় না,—শুধু একটা ভাব—যেন একটা দুর্দ্দমনীয়, অসমকুশলী, মায়াজালমণ্ডিত অপার্থিব ভাব! সে ভাব মাধ্যাকর্ষণের ধার ধারে না, প্রাকৃতিক কোন নিয়মের বাধায় ধরা দেয় না, পৃথিবী যেন সেই ভাব-মহিমায় স্বর্গকে ছুঁইয়াছে, স্বর্গ যেন সেই ভাব-মহিমায় পৃথিবীতে নামিয়া পড়িয়া অঙ্গুলী মাত্র দ্বারা তাহা স্পর্শ করিয়া পুনরায় ঊর্দ্ধে চলিয়া যাইতেছে। কখনও সোয়ার ঊর্দ্ধবাহু, কখনও দুই বাহু দুইদিকে সম্যক্ প্রসারিত, কখনও বা ঘোড়ার উপর দণ্ডায়মান, ঘোড়া কখনও খুর সঙ্কুচিত হইয়া যেন গোলা এড়াইয়া শূন্যপথে চলিয়াছে, ক্ষণে যেন শত্রুর উদ্যত খড়্গাঘাত উপহাস করিয়া দেহটি এমন সাবধানে বাঁচাইয়া যাইতেছে, যেন খড়্গের আঘাত বায়ু-

মণ্ডলকে দ্বিখণ্ডিত করিতেছে মাত্র। বাণ, খড়্গ, গুলি—কিছুই নাই; তবুও দর্শকেরা ঘোড়ার অদ্ভুত ভঙ্গীতে যেন সকলই দেখিতেছে। কখনও উপবিষ্ট, কখনও পদাঙ্গুলী-সঙ্কেতে, কখনও রাশ-স্পর্শে ঘোড়ার গতি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কখনও দেখা গেল, যেন শত শত বাণের মধ্য দিয়া একটি ক্ষিপ্রতর বাণ নিজেকে অক্ষত রাখিয়া ছুটিয়াছে।

বাজাসনের দশজন অশ্বারোহী এবং শৈবাল রায়ের দশজন অশ্বারোহী লইয়া 'চোগান্' খেলা চলিল। শ্যামল ঘোড়ার পেটের নীচ দিয়া চাবুক ছুঁড়িল, এবং সেই চাবুক চালনার গুণে আকাশে উঠিলে ঘোড়ার পিঠ হইতে সে তাহা ধরিয়া ফেলিল। সোয়ার ও তাহার ঘোড়া ক্ষণে ক্ষণে আকাশ-পথে বর্ত্তুলাকারে ঘুরিতে লাগিল। মনে হইল, দুইটি গ্রহ একত্র হইয়া একটা ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়াছে। কোথায় ঘোড়া, কোথায় সোয়ার চেনা যায় না। কিন্নরমিথুনের ন্যায়, পরস্পর আলিঙ্গন-বদ্ধ নর্ত্তকীর ন্যায় তাহারা অবিরাম আকাশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া দর্শকদের সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। "এরূপ হয় নাই", "এরূপ দেখি নাই", এরূপ হ'বে না"—মুহুর্মুহুঃ এই ধ্বনি সেই জন-সমুদ্র হইতে উঠিতে লাগিল। শ্যামল ও তাহার ঘোড়া তখন কোথায়? পৃথিবীর কোন কথা তাহাদের কাণে পৌঁছিতেছে না,—তাহারা অনির্দ্দিষ্ট স্বর্গপথের যাত্রী,—ভাবে মাতোয়ারা, বহু জন্মের বহু তপস্যার পর চির বিরহখিন্ন দুইটি প্রণয়ী মিথুনের মিলন হইয়াছে। এই মিলনে তাহারা যে

কৌশল, যে নিপুণতা, যে যাদু দেখাইয়া চলিতেছে, সেই দিব্য খেলায় তাহারা শুধু আনন্দ-নিকেতনের স্বভাবজ লীলা দেখাইতেছে। তাহাতে শ্রমজ এক বিন্দু ঘর্ম্ম নাই, তাহাতে আয়াসজাত শিক্ষার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই। যাহারা খেলিতেছে, যাহারা দেখিতেছে, তাহারা আনন্দে মূক হইয়া গিয়াছে। আর সে ঘন ঘন জয়ধ্বনি নাই, আনন্দ তাহাদিগকে মূক করিয়া বাক্‌শক্তিহীন করিয়া ফেলিতেছে। কেবল তাহাদের গণ্ডদ্বয় বিপ্লাবিত করিয়া আনন্দাশ্রু বহিতেছে। স্বয়ং মহারাজের চোখ দিয়া যে জল পড়িতেছে, সম্ভ্রম ও সংযমের খ্যাতিতে প্রকাশ্য সভা-মণ্ডপে তাহা মুছিতে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। সভাসদেরা চিত্রার্পিত পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। সেই আনন্দঘন দর্শক মণ্ডলীর ভাব আর কি বর্ণনা করিব? একি ঘোড়-দৌড়ের খেলা না ব্রজের হাটে নীলকান্ত মণির বিকিকিনি! যখন 'চোগান্' খেলা শেষ হইল, এবং শ্যামল ঘোড়া হইতে নামিয়া মহারাজের পদতলে দাঁড়াইল, তখন মনে হইল, অরূপ যেন রূপ ধারণ করিয়াছে। কি সে শ্যামলিমা, কি সে মূর্ত্তি, কি সে রূপ! তাহাদের মনে হইল, এমন রূপ আর তাহারা দেখে নাই।

রাজা তাম্বুলধারিণীর হস্তস্থিত মণিময় পাত্র হইতে স্বহস্তে পান লইয়া শ্যামলকে দিলেন এবং পুষ্পপাত্র হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পুষ্পমাল্যটি লইয়া শ্যামলের গলায় পরাইয়া দিলেন।

শ্যামল করজোড়ে নিবেদন করিল,—“আমি ভীমমল্লের পুত্রের মত, তাঁহার চিরার্জ্জিত বিজয়ের অংশীদার হইতে চাহি না। ইহা আমার সৌজন্যের ভাণ নহে। তাঁহার যদি মনের বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হইয়া থাকে, তবে মহারাজ স্বহস্তে আমাকে যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহার মর্য্যদা লঙ্ঘন না করিয়াও আমি এই আশীর্ব্বাদী ফুলের মালা ও পান ‘মহারাজের’ চরণ-প্রান্তে রাখিতে আদেশ ভিক্ষা করিতেছি। আমি ভীমমল্লের প্রসন্নতার কাঙ্গাল।”

ভীমমল্ল সাশ্রুনেত্রে শ্যামলকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“ভাই, তুমি যখন ঘোড়ার উপর উঠিয়া বসিলে, তখনই আমি বুঝিলাম, তোমার শিক্ষা উচ্চদরের ও স্বতন্ত্র। তেলেঙ্গা, কুরঙ্গই, জলসিংহ প্রভৃতি বহু স্থানের অশ্বারোহী এই রাজধানীতে আসিয়া থাকে ; তাহাদের কাহারও তোমার মত অপূর্ব্ব শিক্ষা নাই। তুমি বাজাসনের মাণিক। এই অল্প বয়সে এরূপ শিক্ষা কোথায় পাইলে, তাহাই আমার চিরবিস্ময় !”

মহারাজের ইঙ্গিতে আর একটি বড় ফুলের মালা আনীত হইল। তিনি তাহা মল্লের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন,—“ভীম, তুমি আমার শত যুদ্ধের সহচর, আমার সেবার চিহ্নস্বরূপ সেই শত যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন তোমার দেহ শোভিত করিতেছে। তুমি এখন প্রবীণ-বয়স্ক। তোমার অভাবে তোমার স্থান কে লইবে, তাহাই ভাবনার বিষয় ছিল। সে দুর্ভাবনা দূর হইল। তুমি চিরকাল এই পুষ্পমাল্য ও পান পাইয়া আসিয়াছ, এবারও তাহা

হইতে বঞ্চিত হইবে না। ইহা আমার অনুগ্রহের দান বলিয়া মনে করিও না, ইহা তোমার চির বিশ্বস্ততা, রণক্ষেত্রে অর্জ্জিত প্রতিষ্ঠা ও এই জনপদের সুপ্রতিষ্ঠ যশের যোগ্য পুরস্কার।"

আবার তাহার পরদিন লাঠিখেলা। দরবারের লেঠেলরা সে দিনও হারিয়া গেল। এই তরুণ কুমারের মাংসপেশীগুলি যেন লোহা দিয়া গড়া। প্রথম চার পাঁচজন, তাহার পর দশজন, এরূপ করিয়া ক্রমাগত একশত পরে দুইশত লেঠেলের দর্প হরণ করিয়া শ্যামল যখন সেই পরীক্ষা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইল, তখন মনে হইল যে, সে বিজয়-লক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত। তাহার শিক্ষার বাহাদুরী অপূর্ব্ব। সেই শিক্ষা অপর কেহ পায় নাই। লাঠিখেলার সময় তাহার একখানি লাঠি শত শত লাঠি ঠেকাইতেছে, শত শত ধনুর গুলি বিমুখ করিয়া দিতেছে। মনে হয় যেন শত শত লাঠির উপর একখানি লাঠির শ্যেন-দৃষ্টি। লেঠেলের হাতমুখ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই, লাঠিখানি যেন মন্ত্রপূত। মন্ত্রবলে লাঠি শূন্যপথে, নিম্নে, উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। পাঁজরের আঘাতে কেহ হেলিয়া পড়িয়াছে, কেহ হাঁটুর সন্ধিস্থলে নিদারুণ ঘা খাইয়া বসিয়া পড়িয়াছে, কেহ বা চোট সামলাইতে না পারিয়া লাটিমের মত ঘুরিতেছে। কাহারও লাঠি এক ক্রোশ দূরে ছুটিয়া যাইয়া যেন রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়াছে। কি অদ্ভুত নিপুণতা! বিপুল, পেশীবহুল, মাংসলদেহ, বীরপুরুষ,—সুদৃঢ় অস্থি, শক্তির পরিচায়ক কাঠামো, ইয়া গোঁফ, চওড়া বুকের পাটা,—সেই সকল মল্লবীর

অপেক্ষাকৃত ক্ষীণদেহ এই তরুণ যুবকের কাছে হেলিয়া পড়িতেছে,—ঝড়ের বেগে যেমন শালতরু নুইয়া মৃত্তিকাশায়ী হয়। মুষ্টিযুদ্ধ, ধনু লইয়া গুলির খেলা, অসি ও বন্দুক লইয়া যুদ্ধাভিনয়,—সকল খেলায়ই শ্যামল জয়ী। তাহার পান ও পুষ্পমাল্যের উপর কাহারও দাবী হইতে পারে না। রাজার বিপুল সৈন্য একবাক্যে স্বীকার করিল, শৈবাল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার অবসরকালে সেনাপতির পদ সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত করিতে সমর্থ।

রাজা তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র জয়ন্তের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার ভার শ্যামলের উপর প্রদান করিলেন। এ যেন কায়ার সঙ্গে ছায়ার মিলন হইল। কুমার জয়ন্ত শ্যামলদা ভিন্ন জানে না। শ্যামলও প্রতি পদক্ষেপে কুমারকে চোখে হারায়। দেখিতে দেখিতে কুমার যুদ্ধবিদ্যায় কৃতী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জাতি-বৈষম্য চলিয়া গেল। রাজকুমার জয়ন্ত শ্যামলকে 'গুরুভাই' বলিয়া ডাকিতেন এবং অনেক সময় অনুগত সহচরের ন্যায় শ্যামলের কাছে কাছে ঘুরিতেন।

তিন

"নাক, মুখ, চক্ষু, কাণ　　　কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার সাবল।
বুক শোভে ব্যাঘ্রনখে　　　অঙ্গে রাঙ্গা ধুলি মাখে
শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে　　　তাড়িয়ে শশারু ধরে
দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে।
বিহঙ্গ ধাঁটুলে বিঁধে　　　লতায় জড়িয়ে বাঁধে
কাঁধে ভার বীর আইসে ঘরে॥"

—কবি কঙ্কণ।

ইহার পর বাজাসন অঞ্চলটা যেন ব্রজের হাট হইয়া দাঁড়াইল। নানারূপ মৃগয়াদির অনুষ্ঠানে দিক দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। একদিকে ভাওয়ালের নিবিড় জঙ্গল, শিশুপালের বাড়ীর ভীষণ অরণ্য, ও নানারূপ শ্বাপদ-সঙ্কুল যশঃ পালের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, দীঘলছিটের নমঃশূদ্র রাজাদের কীর্ত্তিবিধ্বংসী কানাই ও বংশাইর উপকূলবর্ত্তী কণ্টকিত বেতস-কুঞ্জ, ফুলবাড়ীয়ার উত্তর-পশ্চিমে সূচীভেদ্য অরণ্য,—এই বিশাল জনপদ বাজাসনের তরুণ যুবক ও বালকদের ধনুর্ব্বাণ-শিক্ষার ফলে জীবজন্তুশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। এই তরুণেরা কত যে হল্‌দে পাখী, রঙবেরঙের টিয়া,

ইন্দ্রধনুর বর্ণ নুড়ি ও মাছরাঙ্গা জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিত এবং ভীষণ শার্দ্দূল, গণ্ডার ও বরাহের মৃত দেহের ভার লইয়া ভৃত্য ও বাহকেরা উল্লাসপূর্ব্বক আনাগোণা করিত, কত যে কৃষ্ণসার তাহাদের শিরোদ্ভূত জটিল বৃক্ষমূলের মত শৃঙ্গ ও বিচিত্র বর্ণের লেজ লইয়া বাহকদের স্কন্ধে ভারে ভারে ঝুলিতে থাকিত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিজয়ী যুবকেরা সায়ংকালে যখন গৃহে ফিরিত, তখন তাহাদের কাহারও চর্ম্ম ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, শার্দ্দূল দন্তের ক্ষত চিহ্নের উপর রক্তবিন্দু, কাহারও গায়ে বৃক্ষ ও লতার তীক্ষ্ণ কণ্টকের দাগ, কেহ বা আম, জাম ও নানারূপ বন্য ফলে বস্ত্র ভর্ত্তি করিয়া "জয় কুমারের জয়", "জয় শ্যামল সেনাপতির জয়",—মুহুর্মুহুঃ এই সোল্লাস চীৎকার-পূর্ব্বক স্ব স্ব মাতৃ আঙ্গিনায় উপস্থিত হইত। কেহ বা তখন বুনো বরার চর্ম্ম উত্তোলন-পূর্ব্বক জয়ঢক্কা-নির্ম্মাণে লাগিয়া যাইত; তাহাদের মায়েরা কত যত্নে ভিজা নেকড়া দিয়া রক্তের দাগ মুছাইয়া দিতেন। কেহ বা সূচী বা তীক্ষ্ণ লৌহ-শলাকা-দ্বারা তরুণদের চর্ম্মে প্রবিষ্ট পশু-দন্ত তুলিয়া ফেলিয়া বিবিধ রূপে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। যে সকল ক্ষত তাহারা কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিত না। কুমার জয়ন্ত সেন শ্যামলের সাহচর্য্যে এরূপ পালোয়ান ও কুস্তি-প্রিয় হইয়া উঠিলেন যে, সেই অল্প বয়সেই তিনি বীরোচিত কৃতিত্বে বড় বড় সৈনিকের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। রাজা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে শ্যামলের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, যে পর্য্যন্ত সেই তরুণ চণ্ডাল যোদ্ধার সঙ্গে থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বত্র বিজয়ী

হইবেন,—শ্যামলের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিতেও কেহ কুমারের কোন অপকার করিতে পারিবে না।

কিন্তু বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজার শ্যামলের উপর এই অগাধ বিশ্বাস খুব সুচক্ষে দেখিতেন না।

একদিন সায়ংকালে রাজপ্রাসাদের দরবার-মণ্ডপে এইমাত্র স্বর্ণ-দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজা জয়দেব কৃত দশ অবতারের স্তব আবৃত্তি সমাধা করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া বসিয়াছেন। শুভ্র ফরাসটির চতুষ্কোণে স্বর্ণ-সূত্র-গ্রথিত চারিটি কল্‌কা যেন ঝিলিক দিতেছে। শ্বেতবর্ণ ফরাসের উপর সেই উজ্জ্বল কল্‌কা একটা পীত আভা দেখাইতেছে। রাজা কুমারের ব্যয়াম ও রণ-কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে খুব হৃষ্ট। তবে শ্যামল বড় দুঃসাহসী; সিংহ-ব্যাঘ্র-গণ্ডারকে সে ভয় করে না। কুমারও চিরানুগত সহচরের ন্যায় সতত শ্যামলের অনুগামী। কুমার পাছে কোন বিপদে পড়ে, সেই ভয়ে কখনও কখনও রাজার চিত্ত কাঁপিয়া উঠিত। তথাপি তিনি এক একবার এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতেন যে, শ্যামলের প্রাণ থাকিতে কুমারের কেহ কোন অপকার করিতে পারিবে না। এই সকল যুদ্ধ ও মৃগয়াদি ব্যাপার রাজধর্ম্ম। ইহা হইতে সরাইয়া রাখিলে সে ভীরু ও বীর্য্যহীন হইয়া পড়িবে। শ্যামলের মত সৈনিক যাহার দেহ-রক্ষী, তাহার আবার ভয় কি? তিনি বহু তপস্যায় কার্ত্তিকেয়ের আশীর্ব্বাদে শ্যামলের মত একজন শিক্ষাগুরু পাইয়াছেন। এই চিন্তায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—রাজা ও রাজকুমারদের বিপদ

ভাবিতে নাই, বিপদ তো তাহাদের চিরসাথী, শ্যামলের মত সহায় তিনি ভাগ্যবলেই পাইয়াছেন।

যখন তাঁহার চিন্তাধারা এইভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন মন্থর গতিতে রত্নখচিত হস্তি-দন্তের বৈলার সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সহযোগে স্বর্ণ-পাদুকার একরূপ অদ্ভুত শব্দ উৎপন্ন করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজার অনতিদূরে আসিয়া মহারাজের সৌজন্যপূর্ণ আদেশে তাঁহার নিকটে বসিলেন।

রাজা বলিলেন—"ভাল তো মন্ত্রী মহাশয়? কুমারের রণশিক্ষার ও ব্যায়ামের যে সুব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা অবশ্য আপনি স্বীকার করিবেন। আপনিই তো ইহার উপযুক্ত শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন যে ব্যবস্থা ভগবান আপন হইতেই করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদের আশাতীত। অপনি অবশ্যই ইহাতে প্রীত হইয়াছেন।"

মন্ত্রী একটু নস্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"শ্যামলের বীর্য্যবত্তা ও কৃতিত্ব কে অস্বীকার করিবে?"

রাজা—"কেবল কি তাহাই? এই ছেলেটি যুবরাজকে যেরূপ ভালবাসে, তাহাতে মনে হয়, তাহার জননী এবং আমিও তাহাকে সেরূপ ভালবাসিতে পারি না। এ যেন এক বৃন্তে দু'টি ফুল। কে বলিবে শ্যামল চণ্ডাল-পুত্র? তাহার মুখে, চোখে যে প্রতিভার দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য খেলিয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, শ্যামল উচ্চবংশ-সম্ভূত। তাহার জন্ম সম্বন্ধে আমার মনে এখনও একটা খট্‌কা রহিয়া গিয়াছে। আমার যেন মনে হয় এ ছেলেটি উচ্চ বংশে

জন্মগ্রহণ করিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকে চণ্ডালের সাহচর্য্যে লালিত হইয়াছে।”

মন্ত্রী—“চেহারা দেখিয়া এরূপ প্রতারিত হওয়ার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নহে। বৌদ্ধদের দ্বারা আমাদের সমাজে যৌন-সম্বন্ধ এতটা বিকৃত হইয়াছে যে, এ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে ছোট সময় হইতে সে চণ্ডাল গৃহে, চণ্ডাল জনক-জননী-কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়াছে ; স্বয়ং শৈবাল রায়ও ইহার অধিক কিছু বলিতে পারে না। হংসরাজ তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়া গিয়াছে, সুতরাং সে শৈবাল রায়েরও উত্তরাধিকারী। অনেক প্রশ্নের পর ইহার বেশী সে কিছুই বলিতে পারে নাই। যাহা হোক, দ্রোণাচার্য্যও একলব্যের ধ্যান-বলে তাহাকে অদ্ভুত প্রকারের ধনুশিক্ষা দিয়াছিলেন। ব্যায়াম ও কায়িক পরিশ্রমের শিক্ষা শ্যামল দিতেছে এবং শিক্ষা-গুরু হিসাবে যে, সে খুবই যোগ্য ব্যক্তি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু কুমারেরত ইহাই চূড়ান্ত শিক্ষা নহে। সেই এদেশের ভাবী রাজা, সে হিসাবে বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রের শিক্ষাই তো তাহাকে দিতে হইবে।”

রাজা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—“কুমারের মুখে এবং শৈবাল রায়ের কাছে আমি শুনিয়াছি, শ্যামল সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী। তাহার সঙ্গে কোন শাস্ত্র বিচারেই পণ্ডিতগণ আঁটিয়া উঠিতে পারেন না।”

মন্ত্রী—“তবে কি মহারাজ মনে করিতেছেন যে, পবিত্র

ওঙ্কার উচ্চারণ হইতে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্র-শিক্ষা যুবরাজ শ্যামলের নিকট হইতে পাইবে এবং এই কার্য্যে আপনি তাহাকে নিযুক্ত করিবেন ?"

রাজা—"ব্যক্তিগতভাবে আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। তবে হাঁ, তাহাকে আমি পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, সে যদি প্রকৃতই দশজন পণ্ডিত হইতে বেশী গুণী হইয়া থাকে, তবে রাজসভা তো গুণীর আদর ও পুরস্কারের স্থান, আমি কেন তাহাকে যোগ্য পুরস্কার ও সম্মান হইতে বঞ্চিত করিব ? ইহাই কি আমার রাজোচিত বিচার হইবে ?"

মন্ত্রী—"সর্ব্বনাশ, তবে যে হিন্দুধর্ম্ম এদেশ হইতে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, প্রজারা বিদ্রোহী হইবে, পুনরায় এই সমাজে বৌদ্ধাধিকারের বিষ প্রবেশ করিবে !"

রাজা—"কেন ? আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ যে প্রত্যেক ৩৭ বৎসর পরে পরে কৌলিন্যের নব নির্ব্বাচন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তো গুণের আদরই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। রাজা অশোক তাঁহার রাজ্যে ধর্ম্মকার্য্য সুসম্পন্ন হয় কি না, তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য ধর্ম্ম মহামাত্র ও স্ত্রীধর্ম্মমাত্র নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা কি আপনি শোনেন নাই ? সর্ব্বজাতি-নির্ব্বিশেষে নির্ব্বাচিত বৌদ্ধ শ্রমণেরা ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মকার্য্য পরীক্ষা ও পরিদর্শন করিতে নিযুক্ত হইতেন। এদেশে গুণীদের দাবী কখনও সীমাবদ্ধ হয় নাই। তন্ত্রেও জাতি-বিচার অগ্রাহ্য হইয়াছে।"

মন্ত্রী—"মহারাজ, আপনি কি সমাজে আগুন লাগাইতে চাহেন? তাহার পূর্ব্বে আমাকে অবসর দিন। এখানকার ধর্ম্ম-পরিদর্শনের ভার কনোজবাসী গর্গের উপর। আপনি তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন নূতন ব্যবস্থায় হাত দিবেন না।"

রাজা—"যুগে যুগে বৌদ্ধধিকারে 'একাভিপ্রায়ী'র দল নানাবর্ণের পুরুষ ও স্ত্রীলোক হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া এদেশে গুরুগিরি করিয়াছে। তাহাদের মতের উদারতা ও সার্ব্বজনীন শিক্ষা এখনও এদেশে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়া বড় হইয়াছে। এই 'একাভিপ্রায়ীর' দলে চণ্ডাল হইতে সর্ব্বশ্রেণীর যোগ্য ব্যক্তি লোকগুরু নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।"

মন্ত্রী—"মহারাজ, আপনার মত—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের মত। যদি এই বৃদ্ধ বয়সে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান কালে সমাজের মূলে আবার অগ্নি-সংযোগ করেন, তবে হিন্দুধর্ম্মের নিষ্ঠা, বহুযুগার্জ্জিত তপস্যা ও রক্তের বিশুদ্ধতা সমস্তই পুড়িয়া ছাই হইবে। মহারাজ, ভাবিয়া দেখুন, আমি আপনার হিতকামী। মন্ত্রীর গদীতে উপবিষ্ট হইয়া আমি এই সকল ব্যাভিচার দেখিতে পারিব না। বরং আপনি আমাকে বিদায় করিয়া দিয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করুন। আমি কখনই আপনার ইচ্ছার প্রতিরোধ করি নাই। কিন্তু এ যে সর্ব্বনাশের সূত্র। চণ্ডালপুত্র রাজগুরু হইবেন, হিন্দুস্থানের সহস্র সহস্র হিন্দুর ললাটে কালিমা লিপ্ত হইবে। তাহার পূর্ব্বে যেন আমি প্রায়োপবেশন করিয়া দেহাবশেষ করিতে পারি। তরুণদের

মধ্যে প্রগতিশীল বৌদ্ধভাবাপন্ন লোকের অভাব হইবে না। এই তো আপনার প্রিয় পার্ষদ স্থির-বর্ম্মা আছে। ইহাদের মত কাহাকেও মন্ত্রীপদে নিয়োগ করুন।"

বৃদ্ধ মন্ত্রীর চোখে এক ফোঁটা জল আসিতেছিল, তিনি সেই উদ্যত অশ্রু দমন করিয়া স্বর্ণ পদত্রাণ খট্ খট্ করিতে রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক সেই দরবার গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। সহসা রাজার শিরোপরি অবস্থিত মুক্তার ঝালরগুলি সান্ধ্য সমীরণে নড়িয়া উঠিল এবং এক হাজার বাতির ঝাড়টি ঠুন্ ঠুন্ করিয়া অশ্রুসিক্ত সুন্দরীর চাপা কান্নার স্বর তুলিয়া দরবার-গৃহে একটা দ্বিধা ও অবসাদের ভাব আনয়ন করিল।

রাজা ভাবিত হইয়া পড়িলেন। সেই প্রশ্ন লইয়া রাজা গর্গের সঙ্গে দেখা করিলেন। গর্গ অনেক ভাবিয়া বলিলেন—"গুণীই শ্রেষ্ঠ, গুণীই জাতির অলঙ্কার, গুণীর বয়স বা সামাজিক বাধা নাই। যুগে যুগে দেখা গিয়াছে, গুণী সমাজে ও রাজদরবারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আমাদের কবিগুরু লিখিয়াছেন—"গুণঃ পূজা স্থানং গুণীষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।" সেদিনও কাশ্মীরের চণ্ডাল জাতীয় নৃপতি সূর্য্য তিস্থায় বাঁধ দিয়া দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। কবি কহ্লন তাঁহার কথা গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। আমি জানি, অদূর অতীতে বহু গুণী নিম্ন শ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন ও ধর্ম্মগুরুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। যাহার কপালে স্বয়ং ভগবান বিজয় চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছেন, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবে কে?

সুতরাং আপনার সঙ্গে আমার মতের মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই।”

“তবে যাহারা বহু যুগের জাতিভেদ বিদ্যমান থাকার ফলে নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহাদের গায়ে অনেকটা মরিচা ধরিয়া গিয়াছে ; তাহা স্খালন করা অল্প সময়ের কাজ নহে। ধরুন, চণ্ডাল জাতি আহারে-বিহারে, নির্ব্বিচারে খাদ্যাখাদ্য-গ্রহণের ফলে এবং বহুযুগ সঞ্চিত আবর্জ্জনার স্তরে পড়িয়া কতকটা অমার্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ আমরা তাহাদের সঙ্গে পংক্তিরক্ষা করিয়া চলিব কিরূপে ?”

“মহারাজ, যাহারা শুষ্ক ও বাসি মাংস আহার করিতে অভ্যস্ত, এবং নানারূপ অপরিচ্ছন্নতা যাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে উচ্চ কুলের কেহ এক পংক্তিতে আহার করিবেন কিরূপে ? যদি তাহাদের দশজন একত্র হইয়া স্বীয় সমাজের সংস্কার করে ও যথাবিহিত উন্নত জীবন-ধারা অনুসরণ করে, তবে তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য জাতির বৈষম্য কালে মুছিয়া যায়, তবে ভাবী কোন যুগে আমরা তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারি। কিন্তু এখন কি সে সময় আসিয়াছে ?”

রাজা বলিলেন—“শ্যামলের মত গুণীব্যক্তি কি তাহা হইলে চিরদিনের মত শাপগ্রস্ত ও হীন হইয়া থাকিবে ? আপনার কি এই ব্যবস্থা ?”

গর্গ—“শ্যামলের বিদ্যাবুদ্ধি কি হইয়াছে জানি না। যদি সত্য সত্যই সে সর্ব্ব বিষয়ে যোগ্য হইয়া থাকে, তবে তাহার

স্বগণকে বাদ দিয়া তাহাকে উপরে উঠাইব কিরূপে? সুতরাং এখানে সংস্কার-পদ্ধতির ক্রমপরিবর্ত্তনের আবশ্যক। আপনি শ্যামলকে গ্রহণ করিয়া তাহার খুল্লতাত এবং স্বগণকে বর্জ্জন করিতে চাহিলে, শ্যামলই কি তাহা ভাল বোধ করিবে?"

রাজা—"এ সকল তো দূরের সমস্যা, এখনই আমরা তাহাকে সামাজিক কোন উচ্চস্তরে উঠাইতে চাহি নাই। যদি সে শিক্ষকের আসনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া থাকে, তবে সেই পদে তাহাকে অধিষ্ঠিত করায় দোষ কি?"

গর্গ—"দীক্ষাগুরু, শিক্ষা-গুরু, ইঁহারাও পদমর্য্যাদায় ন্যূন নহেন। আপনি কুমারকে দিয়া ইঁহাদের পদবন্দনা করাইবেন, অথচ শৈবাল রায়কে সে মর্য্যাদা দেখাইবেন না, এই বৈষম্য সকলেরই চক্ষে বাধিবে।"

এমনই সময় কলরব করিয়া যুবরাজ ও শ্যামল সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কুমারের কয়েকজন অন্তরঙ্গ, সমবয়স্ক বন্ধুও রাজগৃহে ঢুকিয়া পড়িল। কুমার গর্গের পদ বন্দনা করিয়া রাজার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—'বাবা, তুমি যে শ্যামলদা'কে আমার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিবে, বলিয়াছিলে, সেই কথা রাখিতেই হইবে।'

র্গগ এই কথায় একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কুমারের এতটা আবদার তাঁহার ভাল লাগিল না। অথচ তিনি সতত প্রসন্ন, সদাশিবের ন্যায় আনন্দময়। রাজা তাঁহার ভ্রূকুঞ্চন লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইলেন। কুমারও বুঝিলেন, এতটা আব্‌দার গর্গের

বিরক্তিকর হইয়াছে। এই সময়ে এই সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি হইতে শ্যামল তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া বলিল—"তুমি একি বলিতেছ, যুবরাজ? তুমি কি জাননা, আমি নীচ চণ্ডাল জাতীয়? এরূপ অন্যায় আবদার করিয়া তুমি মহারাজকে কেন ব্যথা দিতেছ? মহর্ষি গর্গকেই বা তুমি কেন অন্যায় অনুরোধের কথা বলিয়া ব্যথিত করিতেছ?"

এই কথায় কুমারের দুইটি নীলোৎপল সদৃশ দীর্ঘায়ত চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। সে মহর্ষির দিকে তাকাইয়া বলিল—"ঠাকুর, আপনার অগোচর কিছুই নাই। আপনি কি জানেন না আমাদের এই শ্যামল দা' একেবারে নিষ্পাপ। ইনি অপূর্ব্ব গুণশালী,—দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণে বিভূষিত। আপনারা কি জানেন না যে, ইহার জাতি, চরিত্র, শাস্ত্রজ্ঞান ও শিক্ষা-সম্বন্ধে কোন প্রতিকূল কথা বলিলে আমার হৃদয়ে শেলের মত তাহা বিদ্ধ হয়? এই কলুষলেশহীন, সম্পূর্ণ নিষ্পাপ দেবকল্প ব্যক্তিকে আমি অন্তরের অন্তরে পূজা করিয়া থাকি। দেব, আপনি বলুন, আমার শ্রদ্ধা কি অপাত্রে নিয়োজিত হইয়াছে?"

এই কথায় গর্গের মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি সহসা উত্তর দিতে না পারিয়া নিতান্ত অনুতপ্তের মত শ্যামলের মুখের দিকে চাহিলেন।

শ্যামল বলিল—"কুমার, তুমি এখনও সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ নহ; সামাজিক বৈষম্য নানা কারণে ঘটিয়া থাকে, তাহা গোপন

করিবার কারণ নাই। আমি বলিতেছি, আমি তোমাকে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়াইবার অধিকারী নহি। তোমাদের গুরুর নিষেধে ও অনুজ্ঞায় তাহার অনেক কথা আমার মুখে শুনিলে তোমাদের প্রত্যবায় হয়।"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কুমার বলিল—"একথা আমি বুঝিলাম না। যাঁহার মন দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল, আকাশের মত উদার, যাঁহার চরিত্র শালতরুর ন্যায় ঋজু ও দৃঢ়, যিনি মিথ্যা ভাষণ জানেন না, যাঁহার মুখে কেহ কখনও শ্রুতিকটু এবং শ্লীলতাহীন কথা শোনে নাই, আমরা যদি কিছুমাত্র অন্যায় করি, তবে তাঁহার দৃষ্টির ইঙ্গিতে সংশোধিত হই, এমন দেবকল্প ব্যক্তিকে যিনি আমাদের অপেক্ষা হীন মনে করিবেন, তাঁহার কথার সঙ্গে সায় দিতে কিছুতেই আমার মন চাহে না।"

শ্যামল বলিল—"কুমার তাহার পিতার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে যে, তিনি আমাকে উহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিবেন। আমি যোগ্য ঋষিতুল্য পণ্ডিতের মুখে মুখে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমি চারি বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, বেদাঙ্গ এবং রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ প্রভৃতির সমস্ত কাব্য পড়িয়াছি। তাহা ছাড়া আমি পাণিনি, কাত্যায়ণ, নিরুক্ত, অষ্টাদশ প্রাকৃতিক ভেদ সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছি আমি সংস্কৃত পড়াইতে চাহি না। মহারাজ যখন তাহাকে আবদারের ফলে প্রশ্রিত করিয়াছেন, তখন আমি প্রাকৃত বিদ্যাই পড়াইব। রগণ, মগন, নগণ প্রভৃতি গণাগণ ও অষ্টাদশ নায়িকা

ভেদ প্রভৃতি পিঙ্গল অনুসারেই আমি ইহাকে পড়াইব, আশা করি, আপনারা তাহাতে অনুমতি দিবেন। আমি আমাদের নিষিদ্ধ শাস্ত্র ইহাকে পড়াইব না।"

গর্গ হঠাৎ যেন আকাশ ছুঁইবার অনুমতি পাইলেন। একদিকে গুণী ও বিনয়ী, মহাপুরুষের লক্ষণাক্রান্ত বালকের মুখ রক্ষা হইল, রাজার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইল না, কুমারও গৃহশিক্ষকরূপে তাহাকে পাইল। অপর দিকে তিনি যে তর্কের মুখে বানচাল হইয়া যাইতেছিলেন, তাহারও অবসান হইল,—কুমারের অতি নির্ম্মল চিত্তে ব্যথা দেওয়া হইতে উদ্ধার পাইলেন; সুতরাং শ্যামলের এই প্রস্তাব তিনি লুফিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন,—"তাহা হইলে রাজপণ্ডিত শিবনাথ বিদ্যার্ণবের নিকট ইনি সংস্কৃতের পাঠ গ্রহণ করুন, এবং শ্যামল ইহাকে প্রাকৃতশাস্ত্র শিক্ষা দান করুন।" এই বলিয়া সভাভঙ্গ হইল। মন্ত্রী শুনিলেন যে, গর্গের অনুজ্ঞাক্রমে শ্যামল কুমারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। এইকথা শুনিয়া তিনি দুইটি হাত দ্বারা মস্তক-ধারণপূর্ব্বক শুদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া ক্রমাগত হাই তুলিতে লাগিলেন।

চার

"এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমিহংস্থিতঃ
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥
প্রতিষিদ্ধ্য শুভং ছত্রং ব্যজনে চ অলঙ্কৃতে।
বিসর্জ্জয়িত্বা স্বজনং রথং পৌরাং স্তথা জনান্ ॥
ধারান্ মনসা দুঃখমিন্দ্রিয়ানি নিগৃহ্য চ।
প্রবিবেশাত্মবান্ বেশ্মমাতুর প্রিয়শংসিবান্ ॥"

—রামায়ণ।

"Adue, adue my native shore !
Fades over the waters blue
The night winds sigh
And the breakers roar.
And shrieks the wild sea-mew

You sun that sets on the sea
We follow in his flight,
Farewell to him and thee,
My native land good night."

—Byron.

সাভার নগরের রাজপ্রাসাদের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে মহারাজ মহেন্দ্র সেন একাকী উপবিষ্ট। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ; দুইশত বাতির একটি ঝাড় হইতে দুইশত শিখা বিচ্ছুরিত হইয়া আলো

নানা রঙ্গের স্ফটিক খণ্ডের উপর পড়িয়াছে এবং সেই একটিমাত্র ঝাড়ের বহুধা বিভক্ত আলোক নীলবর্ণের চন্দ্রাতপ হইতে, আকাশের প্রান্তে রামধনুর মত পর্য্যায়ক্রমে নানা বর্ণের যাদু-খেলা দেখাইতেছে। সেই বর্ণগুলির মধ্যে নীলবর্ণেরই প্রাধান্য। ঝাড়টির নীচ হইতে একটা কাঁচের সুদীর্ঘ দণ্ডের সঙ্গে সংলগ্ন সাদা স্ফটিকের আবরণ হইতে শুভ্র জ্যোতিঃ গৃহস্থিত সমস্ত আসবাবকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। রাজা অতি বৃদ্ধ, বয়স প্রায় একশত হইবে। তিনি চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলে বৈশ্বানর গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহারাজ ভীমসেন স্বর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেন্। তাঁহারা গোঁড়া ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের নেতা ছিলেন। ভীমসেন প্রাতঃস্মরণীয় বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের পৌত্র ছিলেন। গৌড়ের পাট তুর্কী-অধিকৃত হইলে ইঁহারা বিক্রমপুর স্বর্ণগ্রামের রাজধানী হইতে রাজত্ব করিতে থাকেন। সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ইঁহাদের করায়ত্ব ছিল; ইঁহাদের এক শাখা ফরিদপুরের বল্লভদি গ্রামে বাস করিতেন; তাঁহারাও গৌড়েশ্বর উপাধি ব্যবহার করিতেন। অন্য এক শাখার বাজাসনভুক্তির অন্তর্গত সুয়াপুর গ্রামে রাজধানী ছিল।

মহারাজ ভীমসেনের পুত্র ধীমন্তসেন শৈশবে এক বৌদ্ধ শ্রমণের সাহচর্য্য-হেতু বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতা এবং ভ্রাতাদের সহিত বহুদিন যাবৎ ইঁহার মনোমালিন্য চলিতেছিল।

এই সময়ে কণোজিয়া ব্রাহ্মণেরা সেনরাজসভায় অপ্রতিহত

অধিকার চালাইতেছিলেন। ইঁহারা ভিক্ষুদিগের মুখ-দর্শন পাপ মনে করিতেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের ব্যাভিচারের দরুণ সঙ্ঘারাম-গুলিকে ইঁহারা শৌণ্ডিকালয়ের ন্যায় অপবিত্র মনে করিতেন। মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের 'নেড়ানেড়ি' উপাধি দিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে এক পথে চলিতেন না। স্বর্ণগ্রামের রাজ-বাড়ীতে ধীমন্তসেনের প্রশ্রয়ে যখন শ্রমণ ও ভিক্ষুণীরা সর্ব্বত্র আনাগোনা করিত, তখন কণোজিয়া ব্রাহ্মণদের চক্ষে তাহা দুঃসহ হইয়াছিল। ধীমন্তসেনের ভ্রাতারা এসকল কথা লইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বিদ্রূপ, উপহাস, এমন কি সুতীক্ষ্ণ বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি করিতেন। একদিন সিদ্ধবজ্র নামক এক বিখ্যাত শ্রমণ রাজ-বাড়ীতে কুমার ধীমন্তসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন; কুমার তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য খুব সমারোহপূর্ণ আয়োজন করিয়াছিলেন। এদিকে ভ্রাতাদের মধ্যে গোপনে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। তাঁহারা প্রতিহারী, দৌবারিক ও দ্বাররক্ষীদিগকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, যখন মুণ্ডিত মস্তক শ্রমণ তাঁহার সহচরদের সঙ্গে রাজবাড়ীর নয় মহল-বিস্তৃত পুরীর প্রথম তোরণে পদার্পণ করিবেন, তখন যেন সোণার দণ্ড হস্তে দ্বার রক্ষকেরা তাঁহাকে অপমানপূর্ব্বক পুরীতে প্রবেশ নিষেধ করে।

আগুনের স্ফুলিঙ্গ অনেক পূর্ব্বেই ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল;—এবার তাহা শত শিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

মহারাজ ভীমসেনের কাছে উপস্থিত হইয়া কুমার ধীমন্ত সেন বলিলেন—"মহারাজ, আপনি বিচার করুন। নিরীহ শ্রমণেরা

আপনার রাজ্যে কোন অত্যাচার করে না, কোন প্রকার জীব-হিংসা ইহাদের শাস্ত্র নিষিদ্ধ, বিনয়-সূত্রগুলি ইহারা অক্ষরে অক্ষরে জীবনে প্রতিপালন করেন। ইহারা দোষলেশ শূন্য, কটু বাক্যের প্রতিদানে মিষ্টকথা বলেন; ইহারা দিনরাত্র অধ্যয়নে ব্যয় করেন; ঈদৃশ মহাজনদিগের সঙ্গে সংশ্রব আমার ভ্রাতাদের চক্ষে খুব গর্হিত। আজ ইহারা সিদ্ধবজ্রের যে অপমান করিয়াছেন, তাহা এই আচার্য্য-চূড়ামণির মনে কোন ঘা দেয় নাই, কারণ সহিষ্ণুতার গণ্ডারের চর্ম্মে ইহাদের হৃদয় সুরক্ষিত এবং কর্ম্ম-সংযম, বাক্য-সংযম ও ভাব-সংযম ইহাদের আজীবনের তপস্যা ও অভ্যাস। কিন্তু সে অপমান শেলের মত আমার হৃদয়ে বিঁধিয়াছে, জীবনে সে শেল কেহ আমার হৃদয় হইতে তুলিতে পারিবেন না। পিতঃ, আপনি বিচারক, ধর্ম্ম-বিদ্বেষ আপনার নাই, সকল ধর্ম্মের উপরই আপনার শ্রদ্ধা, যাহার যাহার উপাস্য দেবতাকে নির্ব্বিঘ্নে আরাধনা করিতে আপনি স্বাধীনতা দিয়াছেন; এখন বিচার করিয়া বলুন, আমাকে কি করিতে হইবে। সর্ব্বদা বিদ্বিষ্ট বাক্য-বাণে ভ্রাতারা আমার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছেন—।”

এই সময় কোলাহল করিয়া অপর দুই রাজকুমার রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“মহারাজ, এই হতভাগা ভক্ত ভণ্ডকে রাজধানী হইতে দূর করিয়া দিন্। ইহার শ্রমণেরা রাজবাড়ীতে অবাধে আনাগোনা করে,—স্ত্রী-পুরুষে ভেদ স্বীকার করে না, গেরুয়া বা নীল রঙ্গের আলখাল্লা

পরিয়া ইহারা সংযমের ভাণ করে। এদিকে "ধ্যায়েৎ শূন্য মূর্ত্তিং" বা "ওঁ মণিপদ্ম হুঁ" প্রভৃতি মন্ত্র বিড়বিড় করিয়া আবৃত্তিপূর্ব্বক আড়চোখে রাজঅন্তঃপুরিকাদের প্রতি দৃষ্টি-বাণ হানে। এক সপ্তাহ হইল এই সিদ্ধবস্ত্র-নেড়ার দলের এক ভিক্ষু একটা দাসীর কাণে ফুঁ দিয়া মন্ত্র দেওয়ার ছলে যে কাণ্ডটা করিয়াছিল, তাহা মহারাজকে শুনাইবার উপায় নাই! এই কুলাঙ্গার ভণ্ড শিরোমণি ধীমন্ত এবং আমরা কখনই একস্থানে বাস করিতে পারিব না। ভিষকেরা বলিয়া থাকেন, 'কোন দুষ্টব্রণ হাতে হইলে বিসির্পী রোগের দোষে সমস্ত দেহ বিষাক্ত হইতে দেওয়া অপেক্ষা সেই হাতটি কাটিয়া ফেলা উচিত।"

প্রতিবাদ করিতে যাইয়া কুমার ধীমন্ত যাহা বলিতে চেষ্টা করিলেন, তাহাতে উত্তেজনা বাড়িল বই কমিল না। অবশেষে বাক্য ছাড়িয়া হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল।

তাঁহার শাসনের বাহিরে কুমারেরা চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া মহারাজ ভীমসেন বলিলেন—"শুন ধীমন্ত, কে অন্যায় করিতেছে, কে ন্যায় পথে চলিতেছে, তাহা বিচার করিবার বা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। যখন তোমরা তরুণ ছিলে, স্নেহ দিয়া, দরকার হইলে শাসন করিয়া তোমাদিগকে সুপথে আনিয়াছি। কিন্তু এখন তোমরা যৌবনের শেষ ধাপে।" তাহার পর কুমার ধীমন্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি সর্ব্ব কনিষ্ঠ, আমার এবং বড় কুমারদের মতাবলম্বী যদি তুমি না হও, তবে উপদেশ দিয়া বা শাসন করিয়া তোমাকে আমি ফিরাইতে পারিব না।

কিন্তু এটা আমি জানিয়াছি যে, ধর্ম্ম-মাতৃকাদের রাজগৃহে আনা-গোনা অন্তঃপুরিকাদের চক্ষেও দুঃসহ হইয়াছে, ইঁহাদের বিরুদ্ধে নানা কথাই শোনা যাইতেছে। সময়ে সময়ে ইহাদের কমণ্ডলু তর্পণের জল ছাড়া এমন সব দ্রব্য বহন করে, যাহা অপেক্ষা গর্হিত কিছু আমরা কল্পনা করিতে পারি না। সকল ধর্ম্মেরই দোষ ও গুণ আছে। সুতরাং এগুলি লইয়া বাদ-বিসম্বাদ নিষ্প্রয়োজন, উহাতে কোন ফলোদয় হইবে না, সে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

"সুতরাং আমি নির্দ্দেশ করিতেছি যে, তুমি ধীমন্ত আমার বিশাল বাহিনী হইতে কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, দুইশত যুদ্ধ-নিপুণ হস্তী এবং দুই লক্ষ বর্শাধারী পদাতিক এবং সপ্ত কোটি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ কর। এই রাজ্য পার হইয়া উত্তর পশ্চিমে কিরাত রাজ্য, তাহা বড় গঙ্গার দুই শাখা, কানাই ও বংশাই নদীর সীমানায় নির্দ্দিষ্ট,—তুমি সেই দিকে অথবা পশ্চিমে তুর্কীদের অধিকারে যাইয়া কোন রাজ্য বলপূর্ব্বক দখল কর। কিংবা যদি এমন কোন বিস্তৃত পতিত ভূমি কোন প্রদেশ পাও, যাহা তোমার মনোনীত—সেই স্থানে রাজত্ব স্থাপন কর। পুত্র-স্নেহ বড় বিষম বস্তু; আমার ক্ষীণ-দৃষ্টি চোখের জল নিরোধ করিতে পারিতেছি না। পাটরাণীর কষ্ট ভাবিতে আমিও বড় আঘাত পাইব। কনিষ্ঠ রাজবধূর অভাবে আমার রাজপুরী শূন্য হইবে। তিনি এই পুরীর লক্ষ্মী-স্বরূপা, সকলের প্রিয়। তোমা-দিগকে আর দেখিতে পাইব না ভাবিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমার উপায় নাই। রাজভাণ্ডার হইতে যথাযোগ্য বেশ-

ভূষা, স্বর্ণ, জহরৎ এবং অলঙ্কারাদি, ব্যবহারের আসবাব লইয়া তোমারা এই মাতৃভূমি ও জননীর ক্রোড় ত্যাগ কর।" এই বলিয়া রাজা উত্তরীয় প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া নীরব হইলেন।

কুমারেরা এই আদেশে হৃষ্টই হইলেন। মধ্যম কুমার চুপে চুপে জ্যেষ্ঠের কাণে কাণে বলিলেন,—"আদেশ ভালই হইয়াছে, কিন্তু ভাগটা ধীমন্তের দিকে একটু বেশী পড়িল।"

জ্যেষ্ঠ কুমার হরিসেন বলিলেন,—"গৃহহারা, ছন্নছাড়া হতভাগাকে নূতন রাজধানী পত্তন করিতে হইবে। যাহা আমরা জন্মিয়াই লাভ করিয়াছি, সেই জন্মের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া সমস্তই নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। এই সকল ভাবিয়া দেখ, পিতার বিচার ঠিকই হইয়াছে।"

এই কথায় মধ্যম কুমার চুপ করিয়া গেলেন। সেই ক্ষুদ্র পারিবারিক সভা ভঙ্গ হইল। সকলে চলিয়া যাওয়ার পরও ধীমন্ত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা নিঃসৃত হইয়া গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিতেছিল। তিনি তাঁহার মাতার প্রিয়তম সন্তান। পাট-মহিষীর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের শোকে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

পাঁচ

প্রকাশ্যভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বহু শ্রমণসহ কুমার ধীমন্তসেন উত্তরদিকে রওনা হইলেন। তাঁহার সৈন্তেরা সর্ব্বত্র বিজয়ী ও শিক্ষিত। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজাদের তখন অবনতির কাল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ো, হাজাং কিরাত ও চাকমা নেতারা তখন উত্তরে মৈমনসিংহ ও ভাটীরাজ্য দখল করিয়াছিল। তাহারা বর্ষাপ্লাবিত জঙ্গলে স্বাধীনভাবে বাস করিত। শীতকালে তাহারা চিরকাল সেন-রাজাদের হস্তে পরাভূত হইয়া বর্ষায় সেই দুর্গম স্থানগুলি পুনরায় দখল করিয়া লইত। তখন তাহাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ রণকুশলী রাজসৈন্তেরাও সেই সকল দুর্গম পথঘাট চিনিতে পারিত না; এজন্য ধলেশ্বরীর উত্তর তীরের উচ্চ ভূমিতে,—যেখানে বর্ষার বেগে ভূমি প্লাবিত হয় না এবং মৃত্তিকা অতি দৃঢ় ও রক্তবর্ণ, সেখানে শত শত বাণিজ্য তরণী দিনরাত্র ধলেশ্বরীর শুভ্র তরঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে যেন নর্ত্তকীর স্থায় নৃত্য করিয়া সমুদ্রগামী হয়, সেই বাণিজ্য-কেন্দ্র, কৈবর্ত্ত ও সাহাশ্রেণী-সঙ্কুল সাভার পল্লীতে ধীমন্ত বাস স্থাপন করিলেন। নদীর পার হইতে এই নগরীর শোভা কি অপূর্ব্ব! যেন তটদেশ সিন্দুর-মণ্ডিত। অস্তগমনোদ্যত সূর্য্যকররঞ্জিত মেঘমালার মত ঘোর লাল রঙ্গের মধ্যে গুবাক ও তাল বৃক্ষের সারি যেন চিত্রার্পিত। প্রকৃতি যেন স্বয়ং এই পল্লীকে তাঁহার রাজধানী

করিয়া গড়িয়াছেন। ধীমন্ত এইস্থানে উপস্থিত হইয়াই বলিলেন, —"বজ্রচিহ্নিত ইন্দ্রধ্বজ প্রোথিত করিয়া এইস্থানে বাঁশগাড়ি কর।"

প্রথমেই শ্রমণগণ উপস্থিত হইলেন। সেখানকার লোকেরা তথাগতের ধর্ম্মের অনুকূল ছিল, সুতরাং, তাহারা দলে দলে আসিয়া রাজা ধীমন্তসেনের সৈন্যদল পুষ্টি করিতে লাগিল। অদূরে শিশু-পালের গড়, বহু শতাব্দী সেই বৌদ্ধরাজবংশের সংশ্রবে থাকিয়া তদ্দেশীয় লোকেরা অনেকটা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল।

ধীমন্তের পুত্র রণধীর স্বশ্রেণীতে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর বৌদ্ধধর্ম্ম-লাঞ্ছিত এই রাজপরিবারের সহিত ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়দের কেহ আত্মীয়তা করিতে স্বীকৃত হইল না। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কৈবর্ত্ত-পল্লীতে এই রাজবংশ জনৈক প্রসিদ্ধ কৈবর্ত্ত-নেতার পুত্রকন্যার সঙ্গে স্বীয় পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন।

স্বশ্রেণীর মধ্যে ভগিনীর বর মিলিল না, অর্থসম্পদের প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া অতি দরিদ্র কোন ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ও রাজকন্যার পানিগ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। কেবল তাহাই নহে, যুবরাজ মহেন্দ্রকেও এক রূপসী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা কৈবর্ত্তকন্যাকে বিবাহ করিতে হইল। এইভাবে সাভারের রাজবংশ কৈবর্ত্তদের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পার্শ্বস্থ উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান হিন্দু জনসাধারণ হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্র সেনও তাঁহার পিতামহের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি পার্ব্বত্য-

জঙ্গল অনেক পরিমাণে উচ্ছেদ করিয়া নানা স্থান হইতে শ্বেত-চন্দনের তরু তাঁহার রাজধানী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে রোপণ করাইয়াছিলেন। এখনও ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্যে সহসা পথিক চন্দনতরুর ঘ্রাণে সুবাসিত উদ্যান দেখিয়া বিস্মিত হ'ন। সেই নির্জ্জন জঙ্গলে যেন চন্দচর্চ্চিত বনদেবীরা বিহার করিবার জন্য সেই সকল দেব-উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পথিকদের মনে এইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা হইয়া থাকে।

কিন্তু হিন্দুসমাজের নেতা বিশ্বরূপ সেন ও মহারাজ ভীমসেনের যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল, এমন কি মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরাও যে কারণে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ লক্ষণসেনকে আর্য্যাবর্ত্তের রাজগণের আচার্য্য ও গুরু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, হরিশ্চন্দ্রের সময় হইতেই সেনবংশের এই শাখার সামাজিক সে গৌরব আর রহিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম তখন এদেশে বিলয়োন্মুখ ও কনোজিয়া ঠাকুরদের চেষ্টায় ব্রাহ্মণ্য ও কৌলিণ্য তখন বাঙ্গলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সময় ভ্রাতৃদ্বেষী, স্বধর্ম্মদ্বেষী, শ্রমণপন্থী সেনবংশের এই নবরাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত শাখা চতুষ্পার্শ্বের সমাজে হীন হইতে হীনতর হইতে লাগিলেন। যে সময় নেংটী ও কৌপীন পরিয়া লোকে কৌলিন্য-রক্ষার্থ প্রাণপণ করিত, তখন অর্থ, সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা জলাঞ্জলি দিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কুল ও বংশের রক্ত-শুদ্ধিকেই কাম্যবস্তু বলিয়া মনে করিতেন, সেই সময় ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়গণ সাভারের রাজধানী বিষবৎ ত্যাগ করিলেন।

হরিশ্চন্দ্র স্বীয় ভগিনীকে তথাকার এক কৈবর্ত্ত-নায়কের সঙ্গে

বিবাহ দিয়াছিলেন। সাভার ও তন্নিকটবর্ত্তী লোকেরা ইহার পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রমণরাজ সিদ্ধবজ্রের উপদেশে লোকেরা নূতন জীবন লাভ করিল। যেখানে প্রজারা রাজশক্তির অনুকূল সেখানে রাজ্য-শ্রী স্বাবলম্বিত মহিমায় দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। সুতরাং ধীমন্ত সেন অল্পকাল মধ্যে উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত বহু প্রদেশ দখল করিয়া লইলেন। ঐ সকল দেশ হইতে প্রচুর অর্থের আগমে তাঁহার নব-নির্ম্মিত রাজধানী মঠমন্দিরে শোভিত হইয়া উঠিল। ধীমন্ত সেনের দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি ও সৈন্যের সঙ্গে কিরাতেরা বহু যুদ্ধ করিয়াও আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। বংশাই ও ব্রহ্ম-পুত্রের মধ্যবর্ত্তী সুবৃহৎ গারো জনপদ ধীমন্ত সেনের অধীকৃত হইল। ধীমন্ত সেনের পুত্র রণধীর সেন কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়ই যুদ্ধবিশারদ ছিলেন ; তিনি হিমাদ্রির উপত্যকা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ বাহুবলে পরাজয় করিয়াছিলেন।

> "ধীমন্ত-পুত্রো রণধীর সেনঃ
> সংগ্রাম জেতা ইব কার্ত্তিকেয়ঃ।
> হিমালয়-ব্যাপ্ত-দেশান্ বিজিত্য
> সম্বারপূর্য্যাবসৎ প্রবীরঃ ॥" (শিলালিপি)

ধীমন্ত সেনের পৌত্র, মহারাজ রণধীরের পুত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র "ধনাঢ্যঃ কুবেরাধিকঃ", কুবের হইতেও ধনশালী ছিলেন। তিনি তাঁহার বিস্তৃত রাজধানীতে অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল মঠেই তিনি শেষ বয়সে শ্রমণদিগের সঙ্গে বাস করিতেন।

এদিকে বাজাসন বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধরাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীচন্দ্রদেব, ত্রৈলোক্য চন্দ্র প্রভৃতি বিক্রমপুরের পরম সুগত বৌদ্ধরাজারা ইহার সমৃদ্ধির জন্য অশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কথিত আছে তথাগতের পুত্র রাহুল একদা ঐস্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন; সেইসূত্রে উহা একটি বৌদ্ধতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। উহাতে একশত পাঁচ ফিট উচ্চ দশটি মন্দির ছিল; তাহা বালিয়াটির বৌদ্ধ বণিকগণ প্রভূত অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দুই সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করিত এবং দ্বিশত ফিট দীর্ঘ এবং আশি ফিট প্রশস্ত শ্রোতৃগৃহে শ্রমণেরা যখন ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তখন তিন সহস্র ভিক্ষুর আসনের সমাবেশ সেখানে হইত। নানারূপ মণিখচিত সারি সারি স্তম্ভ বক্তৃতাগৃহের শোভাবর্দ্ধন করিত। ব্যাঘ্রমুখ, হংসমুখ, মৃগমুখ, করিশুণ্ড প্রভৃতি নানা কারুকার্য্যখচিত বিচিত্রবর্ণ স্ফটিক স্তম্ভের কীর্ত্তিমুখ শোভা পাইত; সেগুলি দেখিয়া চক্ষু জুড়াইত। চীন, মহাচীন ও যবদ্বীপ হইতে বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও শ্রমণেরা বারংবার এই বাজাসনে আসিয়া প্রধান অধ্যক্ষের উপদেশ শুনিতেন, পঞ্চাশ ষাট ফিট উচ্চ অনেক মঠ তাহাদের উর্দ্ধস্থিত ইন্দ্রধনু ও স্বস্তিক চিহ্ন লইয়া যেন দীর্ঘবৃন্তারূঢ় পদ্মের শোভা বিস্তার করিত। তথাগতের কত শত ধ্যানস্থ পদ্মাসন, বজ্রাসন প্রভৃতি বিবিধআসনে উপবিষ্ট, নানারূপ মুদ্রায় সুবিন্যস্ত অঙ্গুলি বিশিষ্ট মূর্ত্তিগুলি ভক্ত দর্শকের মনে ভাবের উৎস সঞ্চার করিত। পার্শ্ববর্ত্তী ৭০ খানি সমৃদ্ধ পল্লীর আয় এই বাজাসন সঙ্ঘারামের ব্যয়ার্থে নিয়োজিত ছিল।

কিন্তু কালে বাজাসন তথাগতের শ্রীমুখোক্ত ধর্ম্মপদের উপদেশ হইতে একটু স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া নাগার্জ্জুন উদ্ভাবিত হিন্দু-শৈবধর্ম্মের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য সাধন করিল এবং বাজাসনে কতকটা বৌদ্ধ, কতকটা হিন্দুধর্ম্মের মিশ্রণে তথাকথিত মাধ্যমিক মহাযানপন্থীর উদ্ভব হইল। এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ করিয়া জোর দিল তান্ত্রিক ধর্ম্মের উপর। এই তান্ত্রিকতার মধ্যেও এই বিহারে হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র কতকটা মিশিয়া গেল।

এদিকে বাজাসন রাজধানী-ভুক্ত এলাকার নরপতিরা ক্রমে বৌদ্ধভাব ত্যাগ করিয়া গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তথাপি বাজাসনের প্রধান আচার্য্যের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সমস্ত অনুশাসন তাঁহাদিগকে মানিয়া লইতে হইত। এ সম্বন্ধে এরূপ কড়া বিধি ছিল যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রগাঢ় অনুরাগী কণোজিয়া ঠাকুরদের পরিচালিত সেনবংশের এই শাখা বাজাসনের উপর হাত চালাইবার কোন দাবী করিতে পারিবেন না। যদিও হিন্দু তান্ত্রিক যোগীদের ন্যায় বাজাসনের শ্রমণেরা হিন্দুদের অনেক অনুকূল অনুষ্ঠান ও কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি বাজাসনের আইনকানুন—বিশেষ করিয়া তাঁহাদের সামাজিক সাম্য ও জাতিভেদের শিথিলতা—এতই উৎকট ছিল যে, নব জাগ্রত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আবহাওয়ার সঙ্গে এই সঙ্ঘারামের বিধিব্যবস্থা এক হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

এক দিকে সাভারের রাজাদের বৌদ্ধনির্ব্বাণ-বাদ ও অমিশ্র ধর্ম্মপদোক্ত অনুষ্ঠান সর্ব্বপ্রকার তান্ত্রিকতার বিরোধী ছিল।

অপরদিকে সুয়াপুর রাজধানীতে নব ব্রাহ্মণ্যের অভ্যুদয়, এই দুই বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাজাসন তাহার স্পর্দ্ধিত তান্ত্রিকতার দর্পে কাহাকেও গণ্য করিত না।

চিরাগত সংস্কার ও লৌহের ছাঁচে ঢালাইকরা অটুটবিধি-ব্যবস্থার বলে বাজাসনের প্রধান অধ্যক্ষ যে সকল আদেশ চালাইতেন, দুর্জ্জয় সেনকে তাহাতে স্বাক্ষর দিতে হইত। মন্ত্রীর সঙ্গে রাজা অনেক বিচার ও যুক্তি করিয়াছেন, কিন্তু বাজাসনের অবারিত দ্বার নিরুদ্ধ করিতে পারেন নাই। সেখানে চীন হইতে আগত চাংফু, দিশিন্ ও সিন্ সেন প্রভৃতি শ্রমণগণ জ্ঞানবৃদ্ধ স্বামী, প্রজ্ঞানন্দ ও সংযমসিদ্ধ প্রভৃতি নামধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একত্র বসিয়া পানাহার করিতেন। হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য ও আচার-ব্যবহারের রীতি পালন করা সেই ভিক্ষুদের আশ্রম-কেন্দ্র নাম্নার গ্রামে অসম্ভবরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কালে এই সামাজিক বিশৃঙ্খলা এতটা প্রবল হইয়া দাঁড়াইল যে, তাহা পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন হইবে।

মন্ত্রী বলিতেন—"মহারাজ, অপেক্ষা করুন; এখনও জনসাধারণের মতিগতি সম্পূর্ণরূপে ফিরে নাই। যদিও ব্রাহ্মণদের উপর তাহাদের আস্থা ও পূজাপদ্ধতির প্রভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে বিরোধ করার শক্তি এখনও আমরা সঞ্চয় করিতে পারি নাই। টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, এদিকে ভাওয়াল, ধামরাই প্রভৃতি বৌদ্ধকেন্দ্রের জনসাধারণের উপর বাজাসনের আচার্য্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি

খুব বেশী। যদি আচার্য্যের কোন আদেশ আপনি লঙ্ঘন করেন, তবে বৌদ্ধ জনসাধারণ আপনার বিদ্রোহী হইবে। আমি দেখিতেছি, এই প্রতিষ্ঠানের তান্ত্রিকেরা যেরূপ দ্রুতভাবে পতনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন এবং জনসাধারণের উপর যেরূপ ভীষণ অত্যাচারের চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাতে মনে হয়, লোকে তাহা বেশীদিন সহ্য করিবে না। মহারাজ, জানিবেন এই জনসাধারণ উপেক্ষার যোগ্য নহে—এই নীরব কর্ম্মীদের ভাষা সহজে ফোটেনা। অথচ ইহাদের অনুভূতি এত তীক্ষ্ণ যে, ইহারা স্বতঃসিদ্ধ মানসিক শক্তির বলে কি ন্যায়, কি অন্যায়, তাহা পণ্ডিতদেরও পূর্ব্বে বুঝিতে পারে। একবার বুঝিলে তাহারা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া, ফলাফলের দুশ্চিন্তা না করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মহারাজ, রাজাসনের পাপের মাত্রা ষোলকলা পূর্ণ হয় নাই, ঐশ্বরিক বিধান ইহারা এড়াইতে পারিবে না, আমার মনে হয়, তাহা আসন্ন। আপনি অপেক্ষা করিয়া থাকুন। প্রজামণ্ডলীর সঙ্গে তাল রাখিয়া চলুন; যখন সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে বুঝিবেন, ইহাদের অত্যাচার অসহ্য হইয়াছে, তখন প্রজারা আপনার হাতে খড়্গ দিয়া আপনার অনুগামী হইয়া দাম্ভিক আচার্য্যকে উচিত শিক্ষা দিবে।”

রাজা মন্ত্রীর উপদেশ চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন; নকিবেরা ফুকারিয়া উঠিল, দৌবারিকেরা সারিবদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাইল। প্রতিহারী আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

মন্ত্রী ভাবিলেন, মহারাজ প্রবীণ, আজ যদি ইঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশের কোঠায় থাকিত তবে তিনি বাজাসনের অধ্যক্ষের এই দম্ভ সহ্য করিতে পারিতেন না। রাজা "যে সহে, সে রহে" নীতি পালন করিতেছেন।

ছয়

"সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥"

—মহাভারত

আমরা ইহার পূর্ব্বে লিখিয়াছি, একদা সন্ধ্যার পর রাজা মহেন্দ্র সেন তাঁহার একখানি সুশোভিত প্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলেন। সেই গৃহের নানাবর্ণের কাচসমন্বিত ঝালরে বাতির আলো প্রতিবিম্বিত হওয়াতে একটা স্নিগ্ধ নীল দীপ্তি খেলিতেছিল। সেই আলোক পার্শ্বস্থ দেয়ালের পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ ও বিক্ষোভ্যের মূর্ত্তির উপর তরঙ্গিত হইতেছিল। দ্বারের এক কোণে প্রতিহারী মণিময় দণ্ড, উজ্জ্বল স্বর্ণের তক্‌মা ও শ্বেত মস্‌লিনের উপর স্বর্ণমণ্ডিত রক্তাম্বরের টোপর পরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রাজার নিকট মন্ত্রী উপবিষ্ট। মন্ত্রী বজ্রধ্বজ কৈবর্ত্তজাতীয়, বয়স চল্লিশের নীচে,—প্রতিভাময় চক্ষু দুটি দীপ্ত; দেখিলেই বোধহয় তাঁহার চেহারা হইতে তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

রাজা বলিলেন—"বাজাসনের রাজার দূতস্বরূপ সেনাপতি সর্দ্দার শৈবাল রায় কি আসিয়াছেন?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"তিনি বহুক্ষণ যাবৎ বিশ্রামাগারে প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

রাজা বলিলেন—"ইনি প্রতিবেশী রাজা। উত্তর হইতে কম্বোজিয়া ও কিরাতেরা আমাদের রাজ্যের নানাদিক সুবিধা পাইলেই লুণ্ঠন করে ও হুম্‌কী দেখায়। ভাবিয়া দেখ, এই বৈশ্বানর গোত্রীয় বাজাসনের রাজারা আমাদের জ্ঞাতি; ইহাদের সঙ্গে এই সময় লড়াই করা কখনই সমীচীন নহে। নিজেরা নিজেরা ঝগড়া করিয়া এ সময় বলক্ষয় করা কি উচিত?"

মন্ত্রী—"মহারাজ, আপনি অশীতিপর বৃদ্ধ; আপনার তেজ বিক্রম জুড়াইয়া গিঁয়াছে। আপনার আদেশে আমরা কিছুতেই বাজাসনের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারিব না। যুবরাজও রফা করিতে নারাজ। তিনি বলেন, ধামরাই গ্রামে আমাদের যে সঙ্ঘারাম আছে, তাহা ভিন্ন-পন্থী। ঐ সঙ্ঘারামের কর্ত্তৃত্ব আমরা বাজাসনের চীনা আচার্য্যকে ছাড়িয়া দিব না। এথাকার আচার্য্য শান্তশ্রী কিছুতেই ঐ তান্ত্রিক গুরুর অধীনতা স্বীকার করিবেন না।"

মন্ত্রী বজ্রধ্বজ কৈবর্ত্তজাতীয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি যৌবনের সীমা একবারে অতিক্রম করেন নাই। বিশেষতঃ তিনি যুবরাজের শ্বশুর। সুতরাং মন্ত্রীরা যেরূপ চিরকাল সম্ভ্রম ও বিনয়ের সহিত রাজার সঙ্গে ব্যবহার করিতেন, ইঁহার কথাবার্ত্তা ও

ব্যবহার ঠিক তদনুরূপ ছিল না। তিনি তখনও যুবরাজের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সুতরাং কার্য্যতঃ তিনি যাহা বলেন, যুবরাজ ও রাজবধূ তাহাতেই সায় দেন—এই সূত্রে মন্ত্রীই প্রকৃতরূপে রাজ্যের কর্ণধার। যুবরাজ বিশ্বনাথ মনে করেন, তাঁহার শ্বশুর বুদ্ধির সাগর এবং মহারাজ বৃদ্ধবয়সে একেবারে বীর্য্যহীন স্থবির হইয়া গিয়াছেন। পরে যুবরাজের এই শ্বশুর-প্রীতি টুটিয়া গিয়াছিল, তাহা পরে লিখিব।

রাজা বলিলেন—"সর্দ্দার রায়কে আসিতে বল।"

প্রতিহারী শৈবাল রায়কে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। ফরাশ হইতে অদূরে একটা কারুখচিত মহার্ঘ বস্ত্রাবরণে মণ্ডিত পালঙ্কে রাজার নির্দ্দেশ মত শৈবাল রায় রাজাকে প্রণতি জানাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

রাজা বলিলেন,—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমাদের রাজাও বৃদ্ধ। আমার একেবারেই ইচ্ছা নহে, সামান্য সঙ্ঘারামের কর্ত্তৃত্ব লইয়া আমাদের মধ্যে একটা লড়াই বাধে। বিশেষতঃ বর্ব্বর পাহাড়িয়া নেতারা তোমাদের ও আমাদের রাজ্য-প্রান্তে প্রায়ই লোলুপ দৃষ্টি দিতেছে। লুণ্ঠন, দস্যুতা, নিরীহ প্রজাদিগকে হত্যা,—এ তো লাগিয়াই আছে। এখন কি তোমাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া বাধান উচিত? বিশেষতঃ বাজাসনাধিপ এবং আমরা একই বংশের শাখা।"

করজোড়ে বজ্রধ্বজ বলিলেন—"মহারাজ, আপনাদের সঙ্ঘরামগুলির গুরু শাস্তাচার্য্য ও বাজাসনের প্রধান অধ্যক্ষ

ফাহাউন (আচার্য্য বিজ্ঞানানন্দ) উভয়েই বৌদ্ধভাবাপন্ন, কিন্তু শাস্তাচার্য্য তন্ত্র মানেন না। অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল, যখন মহারাজ দুর্জ্জয় সেন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, তখন শাস্তাচার্য্য মন্ত্রবলে ও স্বীয় অব্যর্থ ঔষধ সেবন করাইয়া বাজাসনাধিপের আরোগ্য সাধন করেন। আরোগ্য লাভের পর পুরস্কার ও দক্ষিণা দিতে চাহিলে শাস্তাচার্য্য ধামরাই সঙ্ঘারামের কর্ত্তৃত্ব চাহিয়া লন। তদবধি উক্ত বিহারে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের লেশমাত্র নাই। শাস্তাচার্য্য এখনও জীবিত আছেন, তিনি সমস্তই জানেন। বিশেষতঃ বাজাসনের অধ্যক্ষ যদি সেই সঙ্ঘরামে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান চালাইতে যান, ধামরাই পল্লীর ভিক্ষুরা তাহাতে সম্মত হইবেন না। এই ধামরাই গ্রাম বহু প্রাচীন। এই পল্লীর প্রাচীন নাম 'ধর্ম্মরাজিকা'। মহারাজ অশোক এই পল্লীর পত্তন করিয়াছিলেন। তদবধি তথাগতের অমিশ্র উপদেশ, ধম্মপদ ও তাঁহার শ্রীমুখোক্ত পালি ভাষায় রচিত কথাগুলিই ইহাদের অবলম্বন। ইহারা কখনই তান্ত্রিক শিক্ষা গ্রহণ করিবেন না।"

শৈবাল রায় বলিলেন—"মহারাজ, আপনি ভাবিয়া দেখুন, আপনি যেরূপ এদেশের ছত্রপতি, শাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তা, বাজাসনাধিপ তাহা নহেন। প্রজারা বাজাসনের অধ্যক্ষের কথানুসারেই ধর্ম্মকার্য্য প্রতিপালন করে, এসকল বিষয়ে মহারাজের অনুশাসনের অধিকার নাই। কিন্তু আমাদের বিহারের অধ্যক্ষ মহাশয়ের জেদ, ধামরাই আমাদের গণ্ডির মধ্যে এবং আপনাদের এলাকা বহির্ভূত। গত পঞ্চাশ বৎসর আপনারা

ইহা অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। মহারাজ দুর্জ্জয় সেনের প্রতিশ্রুতির সম্মান রাখিয়া বাজাসন-বিহার এই দানের প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ এই দান করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। মহারাজ যদি বাজাসনাধিপের কাছে উপযুক্ত অন্য কোন প্রতিদান লইয়া এই ধামরাই সঙ্ঘারামকে অব্যাহতি দেন, তবে তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু আচার্য্য ফাহাউনের জেদ অলঙ্ঘ্য; আমাদের মহারাজ তাঁহাকে ভয় করেন। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে বোধ হয় আমাদের মহারাজের এইরূপ দান দেওয়াটা ঠিক হয় নাই।”

মন্ত্রী বজ্রধ্বজ বলিলেন—“তাহা হইবার নহে, সেনাপতি মহাশয়। আমাদের শেষ কথা, ধামরাই সঙ্ঘারাম আমরা ছাড়িয়া দিব না।”

শৈবাল রায়—“মন্ত্রী মহাশয়, আপনি অল্পবয়স্ক। যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা দেশের লোক যেরূপ উৎপীড়িত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, সেই ভীষণ অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। এসম্বন্ধে আমি মহারাজ মহেন্দ্র সেনের কথা শুনিতে চাই।”

মন্ত্রীর মুখ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু রাজা মহেন্দ্র সেনের কটাক্ষপাতে তিনি সাময়িক ভাবে নিরস্ত হইয়া গেলেন।

বৃদ্ধ রাজা বলিলেন—“সর্দ্দার মহাশয়, আমাদের সমস্ত মঠ ও বহারের গুরু শাস্তাচার্য্যের সঙ্গে আপনি আলাপ করুন। তাঁহাকে যদি আপনি বুঝাইতে পারেন, তবে এই ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবাদে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না।”

কিন্তু মন্ত্রীর ভাবে বুঝা গেল, তিনি এই কথা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন না। তিনি স্থান কাল ভুলিয়া বারংবার তাঁহার কোষলগ্ন অসিখানি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাড়াচারা করিতে লাগিলেন। মনে হইল যদি তিনি তখনই চণ্ডাল সর্দ্দারের মাথাটা কাটিয়া ফেলিয়া সেই দিনই যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারেন, তবে রাজ্যশ্রী ও সিংহাসনের গৌরব অটুট থাকে। যাহা হোক্, তিনি সেরূপ কিছু করিলেন না। প্রতিহারী তাঁহার ইঙ্গিতে শৈবাল রায়কে শান্তাচার্য্যের মঠে লইয়া গেল।

শান্তাচার্য্য অতি ধীরভাবে সর্দ্দার শৈবাল রায়ের সঙ্গে আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন—"ধামরাইয়ের সঙ্ঘারাম যশোমাধবের মন্দিরের এলাকাভুক্ত। শিশুপালের বংশধর যশোপাল এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। এই বিগ্রহ পূর্ব্বে সাভারের নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষে বৌদ্ধবিদ্বেষীরা উহা মৃত্তিকানিম্নে লুকাইয়া রাখেন। তখন মূর্ত্তি পাথরের ছিল। তাহার পর যখন বাজাসন বিহারের সত্ত্বাধিকারীরা খুঁজিয়া দেখিতে পান যে, মূর্ত্তির কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন নিম কাষ্ঠে অনুরূপ মূর্ত্তি গঠন করিয়া উহা ধামরাই লইয়া যান। মূলতঃ এই মূর্ত্তি আমাদেরই এলাকাভুক্ত পল্লীর দেবতা। সুতরাং এই হিসাবে আমাদের উহার উপর দাবী আছে। উহার সংলগ্ন সঙ্ঘরামটি আমাদের শ্রমণদের দ্বারাই পরিচালিত। আমরা বিগ্রহের উপর দাবী ছাড়িয়া দিয়াছি, কারণ হিন্দুরা সেই মন্দির কতকটা তাঁহাদের মত করিয়া

নূতন গড়ন দিয়াছেন এবং পূজাপদ্ধতিও বদলাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্ঘারামটির পূর্ব্বাপর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে সর্ব্বপ্রকার আমাদের অধিকার রহিয়াছে। বিশেষতঃ যখন মহারাজ দুর্জ্জয় সেন অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে নিব্যূঢ় স্বত্বে উহার অধিকার আমাকে দিয়া নিজেদের দাবী ত্যাগ করিয়াছেন এবং তদবধি আমরাই উহা দখল করিয়া অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের বিধিব্যবস্থা আমাদের মত করিয়া লইয়াছি, তখন তোমরা কি করিয়া দত্তাপহারী হইতে চাহিতেছ? বাজাসনের তান্ত্রিকদের হাতে এই মঠ চলিয়া গেলে সেখানকার শ্রমণদিগকে বিদায় করিয়া দিতে হইবে এবং আমাদের সর্ব্বপ্রকারে সেবাপরাধী হইতে হইবে।"

সেনাপতি—"স্বামিন্, এসকল কথাই আমি বুঝি। কিন্তু আপনি জানেন, আমাদের তো কথাই নাই মহারাজ স্বয়ং বাজাসনের কোন অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। তথাকার আচার্য্যের অনুশাসন আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লইতে হইবে; এবিষয়ে বুঝিয়াও আমাদের কিছু করিবার সাধ্য নাই। কিন্তু স্বামিন্, আপনারা তান্ত্রিক নহেন, সংযম আপনাদের ব্রত। যখন শাসনসংক্রান্ত কোন প্রশ্ন বা সীমানা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হয়, তখন তীর, ধনু, বন্দুক প্রভৃতির বলে আমরা সে সমস্যার সমাধান করিয়া থাকি। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারে আপনারাই প্রধান। সাভার রাজও সম্পূর্ণরূপে আপনার উপরে বিষয়টির মীমাংসার ভার দিয়াছেন। ধর্ম্মসংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র

সঞ্জয়রামের অধিকার লইয়া এখন একটা দ্বন্দ্ব করা কি উচিত ? তাহাতে দেশময় অশান্তি ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে, অনর্থক শোনিতপাত ও লোকক্ষয় হইবে এবং দুইটি বৃহৎ ভূভাগের নিরীহ শিশু, নারী ও আতুরেরা পর্য্যন্ত প্রাণ হারাইবে !

স্বামীজি কিছুকাল মৌন অবলম্বন করিয়া তাঁহার, পার্শ্ববর্ত্তী শ্মশ্রুবহুল একটি অবধূতকে তথা হইতে উঠিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। গৃহটি একেবারে নির্জ্জন হইল। তখন তিনি বলিলেন,—"শুনিয়াছি বাজাসনের আচার্য্য অতি দুরন্ত প্রকৃতির লোক। তিনি ধর্ম্মের নামে নানা অশাস্ত্রীয় গর্হিত কর্ম্ম করিতেছেন। তান্ত্রিক ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মদ্যপান এবং স্ত্রীলোকের সাহচর্য্য সিদ্ধিলাভের সহজ উপায় এই মত প্রচার করিয়া নানারূপ কুৎসিত কার্য্য করিতেছেন ও তাহার প্রশ্রয় দিতেছেন। তাঁহার অধিকারে প্রজাদের ইজ্জৎ রক্ষা হওয়া কঠিন হইয়াছে। তোমাদের রাজা বৃদ্ধ ও শান্তশিষ্ট প্রকৃতির লোক। তিনি এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। তোমাদের সমাজও এই দুষ্কৃতের দুর্দ্দান্ত ব্যবহারের ভুক্তভোগী হইতেছে। এজন্য আমি বুঝিতেছি, শীঘ্র এমন দিন আসিবে, যখন নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া মেষ শাবকের ন্যায় এই দৌরাত্ম্য সহ্য করিবার জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু সে যখন ধনেপ্রাণে মরিতে বসিবে, তখন,—তৎপূর্ব্বে নহে। এদিকে দুই নৌকায় পা দিলে যাহা হয়, তোমাদের রাজার অবস্থা তাহাই দাঁড়াইয়াছে। একদিকে রাজাসনের নির্লজ্জ অত্যাচার, অপর দিকে কণোজিয়া

বামুণদের ছোঁয়াচে রোগ ও নিম্ন শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা,—সে ঘৃণা এত নিদারুণ যে, তাহা রাজার সহিত প্রজার ভেদ, এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর ভেদ, আহারে-বিহারে প্রতি পদে ভেদ, এক বাড়ীতে দশটা উনুন, প্রতি কথায় জাতি যাওয়া ও ধর্ম্ম লোপের ভয় দেখান, মানুষকে পশুদের অপেক্ষাও হীন করিয়া রাখা, তাঁহাদের মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা, শাস্ত্র পাঠের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা প্রভৃতি নানারূপ উৎকট অনুশাসন দ্বারা জাতির সঙ্ঘশক্তি একেবারে লোপ করা হইতেছে। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতি এবং সেই জাতির মধ্যে দশটি করিয়া ক্ষুদ্র শ্রেণী তাহাদের রান্নার জন্য প্রত্যেকের উনুন জ্বালিতে হয়, তবে রাজসৈন্যগণ যুদ্ধের ক্ষেত্রটাকে যে বিরাট্ রন্ধনশালায় পরিণত করিয়া ফেলিবে। খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা চুকাইতেই যে দিন কাবার হইয়া যাইবে, যুদ্ধ করিবে কখন? শত্রুশঙ্কীয়েরা তোমাদের এই সকল ভোজের নিমন্ত্রণ সমাধা হওয়ার অবকাশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে না। তখন আহারে বসিয়া গণ্ডুষ করিবার সময় গলনালীতে তীরের ফলা ঢুকিয়া ইহলীলা শেষ করিয়া দিবে। আর একটা কথা, তোমরা রাজাদের জন্য তোমাদের বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়াছ। সিংহাসনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তোমাদের বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি এবং রণ-নৈপুণ্যের তুলনা নাই। তোমরাই রাজাসন-ভুক্তিকে নিরাপদ রাখিয়াছ। রাজার হাতে একটি পান সম্মান-স্বরূপ পাইয়া তাহাই চূড়ান্ত পুরস্কার বলিয়া গণ্য করিয়াছ। আর সেই তোমরা, আমি শুনিয়াছি, দরবারে প্রবেশাধিকার

হারাইয়াছ। শুনিয়াছি, তোমাদের কোন জাতির মুখ দেখিলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের যাত্রাভঙ্গ হয়। কণোজিয়া ঠাকুরেরা এদেশের ভাষা জানেন না, তাঁহারা সংস্কৃতে কথা বলেন, সুতরাং আমাদের এই স্থললিত, মধুরাক্ষরা বাঙ্গালাভাষার উপর তাঁহাদের দরদ কোথা হইতে থাকিবে? এ ভাষায় যে জ্ঞানের চর্চ্চা করিবে, সে নাকি নরকে যাইবে তাঁহারা এই অনুশাসন করিয়াছেন। যে ভাষায় রাজা-প্রজা কথা কহিবে, এ দেশে যে ভাষায় মা শিশুকে আদর করেন, যাহাতে সখা তাহার সঙ্গীর গলা ধরিয়া যত প্রাণের কথা স্নেহভরা স্বরে বলিয়া স্বর্গসুখ পান, যে ভাষায় প্রণয়ী-প্রণয়িণীর হৃদয়-রত্নাকরের অমূল্য স্নিগ্ধ আত্মনিবেদনে প্রতি রাত্রে এক একবার করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গের সন্নিহিত করিয়া আনে, সেই মাতৃভাষার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছেন কণোজিয়ারা। তুমি কি বুঝিতেছ না যে, অচিরে এই সকল দুষ্কৃতির ফল ফলিয়া এ দেশকে ছন্নছাড়া করিয়া ফেলিবে? তোমাদের কি এই সকল সহ্য করা উচিত? যদি এই সকল অনুশাসন বা দুঃশাসন তোমরা সহ্য করিয়া লও, তবে তোমরা সহ্য করিলেও প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা অসহ্য হইবে—এ দেশ ছারখার হইবে। ভুক্তভোগী তোমরা দাঁড়াইয়া কি এ সর্ব্বনাশের তামাসা দেখিবে? বাজাসনের এলাকায় চণ্ডালদের সংখ্যা কত?"

শৈবাল রায়—"ইরতা, কুরুঙ্গুই, রোউয়া, ধামরাই, টাঙ্গাইল ও ভাটী প্রদেশ পর্য্যন্ত আমাদের লোক-সংখ্যা দশ লক্ষের অধিক হইবে।"

শাস্তাচার্য্য—"এই দশ লক্ষ লোক কি নীরবে দাঁড়াইয়া নিদারুণ অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিবে? তোমাদের মেয়েরা কি বাজাসনের ভৈরবী-চক্রের জঘন্য ব্যবহারের ইন্ধন জোগাইবে? তোমরা কি রাজদরবারে স্থান না পাইয়া, সেই রাজার জন্য তোমাদের রক্তে তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্র রাঙ্গাইতে সম্মত হইবে? যদি তোমরা ইহা কর, তোমাদের বংশধরগণ তাহা করিবে না। নিশ্চয়ই জানিও উপর্য্যুপরি আঘাতে নিরীহ কীটগুলিও জন্ম-জন্মান্তর পরে ভীষণ বিষধর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আমি দেখিতেছি তোমরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। কিন্তু এখন যদি এই সকল ব্যবহারের প্রতিবাদ কর, তবে তোমাদের সম্মান কতকটা বজায় থাকিবে, অন্যথা এই সমাজ হইতে তোমাদের বিচ্যুত হইতে হইবে।"

শৈবাল—"আপনি আমাদিগকে কি করিতে বলেন?"

শাস্তাচার্য্য—"প্রকাশ করিয়া বলিব? গোপনে বলিব,—তোমাদের হিতার্থ যাহা বলিতে চাই, তাহাতে আমার দ্বিধা করিবার কিছুই নাই। কারণ, আমি অন্যায় কথা বলিব না। দেখ, তুমি তোমাদের সমাজ লক্ষ্য কর,—আমাদের মধ্যে জাতিভেদ আছে, তাহা অনেকটাই ব্যবসার সুবিধার জন্য, কিন্তু সামাজিক বৈষম্য-মূলক নহে। অনুলোম ও প্রতিলোম প্রথায় এবং বিবিধ জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান সর্ব্বদাই আমাদের সমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য চিরকুমার ব্রত শ্রমণ ও সঙ্ঘারামের ভিক্ষুকদের কথা ছাড়িয়া দাও। গৃহস্থগণের

মধ্যে এবংবিধ নিষ্ঠুর শ্রেণীভেদ, দম্ভ, জাত্যাভিমান, সামাজিক বৈষম্য ও বিদ্বেষপূর্ণ পংক্তি রক্ষার নিয়ম নাই। তোমরা এই দশ লক্ষ লোক আমাদের পতাকাধীন হও। তোমাদের মধ্যে যে নিষ্ঠুর ব্যবধানের সৃষ্টি হইতেছে, সেই লৌহ প্রাচীরের মত যে দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়ম তোমাদিগকে প্রাণপাত করিয়া সমাজ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত করিতেছে, তোমাদের সেবা ও রক্তক্ষয়ের দাবী করিয়া তোমাদিগকে পশু হইতেও হীন করিবার উপক্রম করিতেছে, তোমরা সেই একচ্ছত্র ব্রহ্মণ্য-রাজত্ব হইতে সরিয়া আইস, তান্ত্রিক বিভৎসতায় আহুতি হইবার পূর্ব্বে সরিয়া আইস, দরবারে সারমেয়ের মত গুপ্তপথে উঁকি মারিয়া দ্বাররক্ষীর তাড়া খাইবার অপমান হইতে সরিয়া আইস। দেখিতেছ না, ধামরাইর দুই তিন ক্রোশ দূরে তেলেঙ্গা গ্রামের পত্তন হইয়াছে? সেখানে তেলেও সৈন্যেরা আড্ডা বাঁধিয়াছে, তাহারাই এখন গজারোহী, অশ্বারোহী, সেনাপতি হইবে, আর তোমরা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিবে—বাজাসনের সঙ্গে এই সম্পর্ক! তদপেক্ষা ইহা কি শ্রেয়ঃ নহে যে, তোমরা এ দেশেই থাকিবে, কিন্তু হীন পশুর মত নহে—তোমরা সমাজে এক বিশিষ্ট স্থানেই অধিকার পাইবে। শাস্ত্র-চর্চ্চা, শস্ত্র-চর্চ্চা ও নানা কলাবিদ্যা, যথা ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও চিত্র-বিদ্যা প্রভৃতিতে কৃতিত্ব লাভ করিয়া গুণী হইতে পারিবে। এ সকল অধিকার হইতে যে তোমরা বঞ্চিত হইতে চলিতেছ, তাহা কি তোমরা বুঝিতেছ না? তোমাদের দশ লক্ষ লোক যদি সাভারের এলাকাভুক্ত হয়, তবে ভাওয়ালের অপর্য্যাপ্ত

পতিত ভূমিতে ও জঙ্গল কাটিয়া তোমাদের উপনিবেশের সুবিধা করিয়া দিব। এ দিকে তুর্কীরা পশ্চিম-বঙ্গ দখল করিয়া, এদেশে আসিতেছে, উত্তর দিক হইতে গাজীদের হুঙ্কার শুনা যাইতেছে; ভাটীতে শিলাদিত্য ও কুমারী শিলাবতী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিযাও তাঁহাদের প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, দলে দলে হিন্দু ইস্‌লাম গ্রহণ করিতেছে। এখন হিন্দুদের সঙ্ঘশক্তির দরকার। যাহারা একটা বড় জাতিকে ভাঙ্গিয়া কাচখণ্ডের মত শত টুক্‌রা করিয়া ফেলিবেন, তাঁহারা ভেদ নীতি দ্বারা প্রজাদের যে দুর্দ্দশা ঘটাইবেন, অচিরে তাহাদের সেই সকল ফল ভোগ করিতে হইবে।"

সেনাপতি—"স্বামিন্, আমরা আমাদের রাজাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।"

শাস্তাচার্য্য—"তোমাদের এই অবশ্যম্ভাবী দুর্গতির কোন প্রতিকার করিবে না?"

সেনাপতি—"স্বামিন্, প্রথমতঃ আপনি কণোজিয়া ঠাকুরদের যে ছবি আঁকিলেন, তাহা ঠিক নহে। তাঁহারা সম্পূর্ণ ভোগ-বিমুখ ও নিষ্ঠাবান্, তাঁহাদের ভক্তি দেখিলে আপনারও শ্রদ্ধা হইবে। তাঁহারা নিঘৃণ, অপক্ষপাতী এবং পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তিকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিয়া কেবল জপতপ লইয়া থাকেন। রাজা-প্রজা তাঁহাদের কাছে এক—পরের ইষ্ট ভিন্ন তাঁহারা কখনও অনিষ্ট করেন না। তাঁহারা অযাচক-বৃত্তি,—কাহারও দান গ্রহণ করেন না। কেহ কিছু দিলে খান, নতুবা খান না। তাঁহাদের

দুশ্চর তপস্যা ও উপাসনাদি আপনি দেখিলে বিস্মিত হইবেন। ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐশ্বর্য্য—ধর্ম্মের দান লইয়াই তাঁহারা আসিয়াছেন। তাঁহারা আচার প্রতিপালন করেন, এই আচার পালনের জন্যই তাঁহারা আচার্য্য। ধরুন, যদি কেহ একটা বহুমূল্য মনি পায়, তাহা সে কত যত্ন-সহকারে রক্ষা করে ;—পাছে কোন মলিনতার ছোঁয়াচ লাগিয়া তাহার গৌরব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; এই আশঙ্কায় সে সাবধান থাকে। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত বিদ্যাবিশারদ যেরূপ তাহার কণ্ঠের আওয়াজ ঠিক রাখিবার জন্য আহার-বিহারে সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন, তাঁহারাও তাঁহাদের জীবন ও চরিত্রের উপর পরকীয় দূষিত প্রভাব না পড়ে, সেইজন্য সর্ব্বদা সতর্কদৃষ্টি। উৎকৃষ্ট বীণাযন্ত্রের তারগুলি বাদক এরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখেন যে, কোন জায়গা একটু শিথিল হইলে, সেই বীণা দ্বারা আর সঙ্গত হয় না। তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই আদর্শ ধর্ম্ম বজায় রাজার জন্য, বাহিরের জড়বাদীদের সংস্পর্শে তাঁহারা এজন্য ভীত। রাজা গেল কি রহিল, তাহাতে তাঁহাদের কি? তাঁহারা রাজ্যকামী নহেন। ভারতবর্ষ কোনদিন ভোগসুখী হইয়া ঈশ্বরকে ভুলে নাই, এজন্য দুষ্ক্রিয়া, নিজের ভ্রাতার গলায় ছুরি, পরস্পরকে হনণ ইত্যাদি কার্য্যে জগতের লোক রত হয়, ইহা তাঁহারা চাহেন না। এই ভারতবর্ষের প্রধান বন্ধন ইন্দ্রিয়-বন্ধন। কেহ হাত, পা বাঁধিলে তাহার স্বাধীনতা লুপ্ত হয় না, কাহারও সম্পত্তি নষ্ট হইলে তাহার প্রকৃত সম্পদ যায় না। যাহা চিরন্তন, যাহা জীবন-মরণের সঙ্গী, যাহার প্রভায় আত্মা পুণ্যালোকে জ্যোতিষ্মান হ'ন,

সেই হোমানল তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেই জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষে বলি, কংস, রাবণ, জরাসন্ধ প্রভৃতি কত বীর্য্যশালী রাজাই না যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন! ভারতবর্ষে তাঁহাদের জন্য কোন মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই, কিন্তু একটা বনের বানর প্রভুভক্তি দেখাইয়াছিল, তজ্জন্য হনুমানোপাসকদের ষাট্ হাজার মন্দির এদেশে আছে। এই নিবৃত্তি-ধর্ম্মই এদেশের সর্ব্ব ধর্ম্মের সেরা। ভারতবর্ষ যে পরিমাণে ভোগমুখী হইবে সেই পরিমাণে ধ্বংস পাইবে, যে পরিমাণে সে নিবৃত্তির গেরুয়া ধারণ করিয়া থাকিবে ও সংযমের হোমানল জ্বালাইয়া রাখিবে ; সেই পরিমাণে সে যুগের পর যুগ টিকিয়া থাকিবে। ভারতবর্ষের ইহাই ধর্ম্ম, জগতের ধর্ম্ম ভারতের ধর্ম্ম নহে। সব-দেওয়া-বাবা বলিয়াছেন, "সব দে দেও"। "কি দিব ?" জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন, —'সব্ গুরুকো, রাজাকো, স্বামীকো দে দেও।' আমরা রাজাকে সব দিয়াছি। ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি, তাহা জানি না, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার আমরা করিব না। আমরা গুরু-বাক্য পালন করিয়া সর্ব্বস্ব দেওয়ার পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছি। আপনারা আত্মা মানেন না, ভগবান্ মানেন না, হয়ত তর্ক করিয়া কেহ আপনাদিগকে হটাইতে পারিবে না। কিন্তু পাণ্ডিত্য, অশেষ তর্ক বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকিলেও একটুকু ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মজ্ঞান আমাদিগকে যাহা দিতে পারিবে, আপনারা তাহা দিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণেরা আমাদিগকে ছোঁন না, ইহা ভুল। কনোজিয়াদের চক্ষে কোন বৈষম্য নাই। নিম্নস্তরের লোকেরা

সর্ব্বদাই একটু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে, গোঁড়া পুরোহিত-শ্রেণীর লোক এই সকল ভেদ গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থের জন্য। তাঁহাদের অত্যাচার সকল সময়েই প্রত্যেক সমাজে আছে ; কালে কালে প্রতিক্রিয়া হইয়া তাহার নিরাকরণ হইবে। বিশেষ বৌদ্ধেরা এ পর্য্যন্ত সমাজে অপাংক্তেয় ছিল, কনোজিয়া ঠাকুরেরা তাঁহাদের মধ্যে অনেককে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া "নব শাখা" বা নবশাখদের সৃষ্টি করিয়াছেন, কালে এই শ্রেণীগুলির আরও সম্প্রসারণ হইবে আশা করা যায়। তবে, আমি কি বুঝিব আপনারা ধামরাই সঙ্ঘারামের দাবী ছাড়িবেন না?"

শান্তাচার্য্য—"তাহা বই কি? আমরা প্রজামণ্ডলীর হিতার্থ যাহা উচিত বোধ করিব, তাহাই করিব। তোমার নিকট আমার এই অনুরোধ রহিল, আজ এখানে তোমাদের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা কাহাকেও বলিও না।"

সেনাপতি—"যে আজ্ঞা।"

গুপ্তচরেরা আসিয়া রাজা দুর্জ্জয় সেনকে বলিল, "সাভারের মন্ত্রী ও যুবরাজের শ্যালক কৈবর্ত্ত বজ্রধ্বজ আমাদের সেনাপতি মহাশয়কে অপমান করিয়াছে। সাক্ষাতে তো নানারূপ কটূক্তি করিয়াছেই, অসাক্ষাতে তাঁহার জাতি তুলিয়া যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহা আমাদের সেনাপতি শোনেন নাই। সেই সকল কথায় এতটা ইতরামি আছে যে, এত বড় পদস্থ ব্যক্তি সে সকল কথা কি করিয়া মুখে আনিলেন—তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না! ইহা ছাড়া এই কৈবর্ত্ত মন্ত্রী অতি দুশ্চরিত্র। তাঁহার

যে সকল কথা শুনিলাম, তাহা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। সেনাপতির সঙ্গে রাজার যে কথাই হোক্ না কেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের মঠাধ্যক্ষ শান্তাচার্য্যের যে সকল কথা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় না যে, আসন্ন যুদ্ধ আপনারা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন।"

সেনাপতি আসিয়া রাজাকে বলিলেন,—"আমাকে যাহাই বলুক না কেন, আমি তাহা গণ্য করি না। আমার গুপ্তচরেরা সে সকল কথাই আমাকে জানাইয়াছে, আমি সে সকল কথার উপর জোর দেই নাই। কিন্তু রাজা মহেন্দ্র সেন ও শান্তাচার্য্যের সঙ্গে ধামরাই সঙ্ঘারাম লইয়া আমার যে আলোচনা হইয়াছে, তাঁহাদের কথায় বুঝিলাম, সমস্যাটি আরও গুরুতর ও বৃহত্তর। তাঁহারা এদেশে বাজাসনের প্রাধান্য ও তান্ত্রিকতার প্রভাব রাখিতে চান না, তাঁহারা এইরূপ প্রতিষ্ঠান নির্ম্মূল করিতে ইচ্ছুক, ধামরাইয়ের সঙ্ঘারামের ব্যাপার উপলক্ষ্য মাত্র।"

শান্তাচার্য্য যে এই সূত্রে বাজাসন এলাকার চণ্ডাল সৈন্যদিগকে তাঁহাদের 'হীনযান' মতে দীক্ষিত করিতে এবং এইভাবে সাভারের বাহিনী বৃদ্ধি করিয়া তথাকার রাজার সৈন্যবল বাড়াইতে চান, এই কথা সেনাপতি গোপন রাখিলেন। কারণ, বিষয়টি সংগোপন করিতে তিনি শান্তাচার্য্যের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন।

যুদ্ধ বাধিলে শ্যামল ও যুবরাজ জয়ন্ত উভয়ে সেনাপতির সঙ্গে নেতৃত্ব করিবেন, এই প্রস্তাবে দুর্জ্জয় সেন বাধা দিলেন না।

যুবরাজ এখন ষোড়শ বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন এবং শ্যামলের চব্বিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে আরও কিছুদিন বাকি।

যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। কাড়া, নাকাড়া প্রভৃতি বাজাইয়া ধামরাইয়ের নিকটবর্ত্তী তেলেঙ্গা প্রভৃতি পল্লী হইতে পঁচিশ হাজার তেলেগু অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া বাজাসনের কাছে শিবির স্থাপন করিল; নান্নার হইতে দশহাজার ঢালী কৈবর্ত্ত, রোউয়া হইতে একলক্ষ চণ্ডাল সৈন্য, টাঙ্গাইল হইতে অশ্বারোহী, গজারোহী, পদাতিক আরও ত্রিশ হাজার সৈন্য উপস্থিত হইল। যুদ্ধের কথা ছাড়া আর কোন কথা নাই। মদের বোতল লইয়া মাতালের যেরূপ উৎসাহ, যুদ্ধের বেলায় এই সকল সৈন্যের ততোধিক উৎসাহ।

এদিকে সুবৃহৎ যুদ্ধ-জাহাজগুলি কোনটি কামানে পূর্ণ, কোন কোনটি বারুদে বোঝাই। ইহার মধ্যে আসিয়া জুটিল কুড়ি হাজার 'রোসাইঙ্গা' তীরন্দাজ সৈন্য। তাহাদের তীরের একদিকে পালক লাগান, অপর দিকে বিষাক্ত ফলা।

সমস্ত বাজাসন অঞ্চল কাঁপিয়া উঠিল। তান্ত্রিক ধর্ম্ম উচ্ছেদ ও বাজাসন ধ্বংস করার কথা অধ্যক্ষ ফাহাউচের কাণে গিয়াছে। তিনি তাঁহার গেরুয়া আলখাল্লার মধ্য হইতে একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত তেজ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং রণোদ্যমের জন্য ধন-ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিলেন।

সাত

"মন্দির-বাহিরে কঠিন কপাট
চলইতে শঙ্কিত পঙ্কিল বাট
তাহে অতি দূরতর বাদল-দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥"
—গোবিন্দদাস্।

পূর্ব্বের একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করার প্রয়োজন হইয়াছে।

রাজা মহেন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ বিমলেন্দু ২২ বৎসর বয়সে অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। তাঁহার বিধবা মহিষী ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশের এক মহাকুলীন, রাঢ়বাসী আঢ্য ব্যক্তির কন্যা। তাঁহার সেই কন্যা ছাড়া আর কেহ ছিল না এবং তাঁহার ধর্ম্মমতও কতকটা তথাগতের ধর্ম্মের অনুকূল ছিল। এজন্য তিনি তাঁহার পরমা সুন্দরী কন্যা স্বর্ণমঞ্জরী দেবীকে যুবরাজের সঙ্গে বিবাহ দিয়া সাভারে আসিয়াই বসবাস করিয়াছিলেন। যুবরাজের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সুতরাং যুবরাজ-পত্নীর পিতৃকুল, মাতৃকুলের কেহ সাভারে ছিলেন না।

যুবরাজের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান হয়। সে যখন অপোগণ্ড শিশু, তখন স্বর্ণমঞ্জরী দেবীর বৈধব্য ঘটিয়াছিল। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাইতে পারেন

নাই, স্মৃতিকারেরা তাঁহার ক্ষুদ্র শিশুটিকে ফেলিয়া তাঁহাকে মরিতে দেন নাই। মাতৃস্নেহের আকর্ষণে বৈধব্য-যন্ত্রণা তিনি বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

কিরাতদিগের সঙ্গে যুদ্ধে কুমার বিমলেন্দুর মৃত্যু ঘটে; এই মৃত্যু অতি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিয়াছিল। শিশুপালের রাজধানীর কাছে সামান্য কতকগুলি কিরাতের বিদ্রোহ। যুবরাজ হাসিতে হাসিতে তাঁহার বৃহৎ হংসগ্রীব নামক কৃষ্ণবর্ণ অশ্বারোহণে কতকগুলি কৈবর্ত্ত সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ-দমনার্থ গিয়াছিলেন। সেইদিন অপরাহ্নে স্বর্ণমঞ্জরী রত্নখচিত দর্পণে স্বীয় মুখ দেখিয়া তাঁহার বক্রান্ত সুকুঞ্চিত কেশভার বেণীবদ্ধ করিতে-ছিলেন। একখানি সোনা ও মণির বুটিদার মছলিনের নীল সাড়ী পরিয়া রত্নালঙ্কৃত দেহে যখন তিনি দাঁড়াইলেন, তখন মনে হইল, যেন দীঘির সুনীল জলে লহরী উঠিয়াছে ও তীরবর্ত্তী পুষ্পলতা হইতে অজস্র ফুল জলের মধ্যে ভাসিয়া তাহার শোভা অশেষরূপে বাড়াইয়া দিয়াছে। তাঁহার পদযুগে সখীরা কত যত্নে আল্‌তা পরাইয়া দিয়াছে। নীল সাড়ীর মধ্য হইতে রক্তবর্ণে রঞ্জিত কটিবাসের ছটা সাড়ীর নীলবর্ণ লোহিতাভ করিয়া দিয়াছে। কি সুন্দর শতদলের মত মুখখানি! অলকা-তিলকা গণ্ডে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, মাথার সিঁথীতে সিন্দুর-বিন্দুর পার্শ্বে মুক্তার ঝালর দুলিতেছে এবং কাঁচুলিতে রেশমী-সূতায় তথাগতের কয়েকটি জাতকের দৃশ্যাবলী অঙ্কিত হইয়াছে। কস্তুরীর তিলক মাথার উপর মণিমুক্তাকে যেন দেবালয়োচিত

আরতির পবিত্র গন্ধে সুবাসিত করিতেছে,—সাতলহরী হারের মধ্যে মরকতের লাল আভা, নীলার জ্যোতিঃ ও বৃহৎ একখানি হীরার পদক কি না অপূর্ব্বভাবেই শোভা বাড়াইয়াছে !

স্বামী যুদ্ধ জয় করিয়া আসিবেন,—আসিয়া রণ-পরিচ্ছদ না ছাড়িয়াই তিনি কত যত্নে সোহাগ করিবেন ; স্বামী সোহাগিনীকে ফুলবাড়িয়ার সুপ্রসিদ্ধ মাল্য-শিল্পী মল্লিকা মালিনী দুইটি সুবৃহৎ পুষ্প-মাল্য রচনা করিয়া দিয়া গিয়াছে। দুইটিই যুবরাজ পত্নী মণিময় পুষ্পপাত্রে জলবিন্দুতে আর্দ্র করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন,—তাহার একটি তিনি কুমারের গলায় নিজে পরাইবেন, অপরটি কত সোহাগ করিয়া নিবিড় আলিঙ্গন দিয়া স্বামী তাঁহাকে পরাইয়া দিবেন।

সখী রঙ্গমতীকে তিনি বলিতেছেন—"দেখ্, বেলা প্রায় শেষ হইল। সন্ধ্যার গোলাপগুলি ফুটিয়াছে, কিন্তু কিছু পরেই ম্লান হইয়া যাইবে। অগুরু শ্বেতচন্দন ও কস্তুরীর ফোয়ারার জলের সঞ্চয় কমিয়া আসিয়াছে, প্রখর সূর্য্য কিরণে এখনও তাহারা একটু গরম আছে। এখন তাহা ভৃঙ্গার ভরিয়া তুলিয়া রাখ্, নতুবা তাহা জুড়াইবে না। কুমার রণশ্রান্ত হইয়া আসিলে তোরা কি গরম জল দিবি ? শান্তাচার্য্যের মঠ হইতে যে প্রসাদী পুষ্প ও নৈবেদ্য আসিয়াছে, তাহার ফুলগুলি আর্দ্র করিয়া রাখ্। কুমার রণক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া আসিলে তিনি কিছু তো খাইবেন। মঠের প্রসাদী মিষ্টান্ন জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিয়া তিনি খাইতে বসিবেন। মা রাণীকে বল্‌গে সূপকারদেরে আদেশ

করিয়া তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত রাখিতে। মঙ্গল ঘটগুলির ফুলমালা কেমন এলোমেলো হইয়া আছে। তিনি সকলই অতি সুশৃঙ্খল দেখিতে ভালবাসেন, বিশৃঙ্খলা তিনি কিছুমাত্র সহ্য করিতে পারেন না। সেগুলি ভাল করিয়া ঠিক করিয়া রাখ্। মন্দুরার প্রধান কর্ম্মচারীকে বল্‌গে যে, তাঁহার বৃহৎ কৃষ্ণ অশ্ব হংসগ্রীবের গা ধুইবার জন্য গরম জল প্রস্তুত রাখে ও স্বর্ণমার্জ্জনীদ্বারা এখনই তাহার রক্তাক্ত দেহ মার্জ্জিত করিতে হইবে। রঙ্গমতী, বসিয়া রহিলি কেন? শীঘ্র প্রজ্ঞাপারমিতার মঠে যা, সেখানে ধর্ম্ম-মাতৃকাদিগকে বল্‌গে, যুবরাজ যুদ্ধ জয় করিয়া এখনই ফিরিবেন। তাঁহারা যেন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়াই সহচরীদের দ্বারা পঞ্চপ্রদীপ দোলাইয়া, শাঁথ বাজাইয়া তাঁহার আরতি করেন।"

এক কোণে কুঞ্জলতিকা নাম্নী দাসী দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! খোকাকে এখনও তুই বেশ-ভূষা পরাস্ নাই! তিনি আসিয়াই উহার গালে চুমা খাইবেন, রুমাল দিয়া মুখ মুছাইয়া কোলে লইবেন, উহাকে না দেখিলে যে তিনি পাগল হইয়া যান! এখনও উহার শরীরটা পর্য্যন্ত মার্জ্জনা করিস্ নাই! কি আশ্চর্য্য; হাতে ধুলা লাগিয়া রহিয়াছে। তিনি কত রাগ করিবেন। না, তোরা আমাকে পাগল করিয়া ছাড়িবি। ওকি তুই কাঁদিতেছিস্ কেন! আঁচলে চোখ মুছিতেছিস্ কেন? তোকে আজ এই বিজয়ের দিনে কে মনোব্যথা দিয়াছে?"

তখন কুঞ্জলতিকা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে

রাজপ্রাসাদের পাষাণ-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া মহারাণীর কণ্ঠ হইতে একটা প্রাণভেদী চীৎকার আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া উত্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে "যুবরাজ তোমার বড় সাধের সাভারের সিংহাসন ছাড়িয়া কোথায় গেলে"—এই ঘোর রোলে বহু নারী কণ্ঠের ক্রন্দনে রাজপ্রসাদ পূর্ণ হইয়া গেল এবং মধ্যে মধ্যে হংসগ্রীবের উচ্ছ্বসিত হ্রেষারব যেন সেই বিশাল কোলাহলের করুণ কান্না বাড়াইয়া দিল। কোথায় গেল সে বিজয়োল্লাস, যুবরাজের আলিঙ্গনের স্বপ্ন, কোথায় গেল ফুলের মালা, ধূপ ও পুষ্পপাত্রের সুরভি, দেবতার আশীর্ব্বাদ! যুবরাজ-পত্নী অজ্ঞান হইয়া কঠিন মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন।

রাজা মহেন্দ্র সেন পুত্রশোকে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কুমার বিশ্বনাথ তখনমাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক। কৈবর্ত্ত নেতাদের একজনের ঘরে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। বহুদিন হইতে রাজার এই পুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব তিনি চালাইয়াছিলেন। এই কৈবর্ত্ত নেতার নাম বজ্রধ্বজ। তিনি ছিলেন সুদর্শন, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও কথাবার্ত্তা বলিতে নিপুণ। রাজাও তাহার কন্যাটিকে দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। যুবরাজের ঘোর অনিচ্ছার জন্য এত দিন এই প্রস্তাব অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা একেবারে সংসারে অনাসক্ত হইয়া পড়িলেন, রাজমহিষীকে

স্তোকবাক্যে ভুলাইতে বজ্রধ্বজের বেশী কষ্ট হইল না, যেহেতু স্বশ্রেণীর মধ্যে যোগ্যা কন্যা পাওয়া তখন সাভারের রাজাদের অসম্ভব হইয়াছিল। এই কৈবর্ত্তদের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী শিশুপালের রাজপরিবারেরও বিবাহের আদান-প্রদান হইয়াছিল। তরুণ বয়স্কা, বিধবা বউরাণী যদিও স্বামীর অনিচ্ছা হেতু এই বিবাহের পক্ষপাতিনী ছিলেন না, তথাপি এখন তিনি সাংসারিক সমস্ত বিষয়ে একরূপ নির্লিপ্ত। রাজা মহেন্দ্র সেন তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"এই বিবাহ তিনি পছন্দ করেন নাই, তাহা আপনি ভালরূপেই জানেন। তবে তাঁহারও বয়স বেশী ছিল না—পরিণত জ্ঞান বা সংসারের অভিজ্ঞতা সে বয়সে হইবার নহে। আপনি ও মা মহারাণী যাহা করিবেন, সেই বিধানই আমি মাথা পাতিয়া লইব। আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি ?"

এদিকে মহারাণীর সঙ্গে স্বর্ণমঞ্জরীর সদ্ভাব ছিল না। প্রিয় পুত্রকে বিবাহিত দেখিতে প্রথম তাঁহার মাতা যেরূপ উৎসুক ছিলেন, বিবাহের পর পাছে পুত্র স্ত্রীকে ভালবাসিয়া পর হইয়া যায়,—এই আশঙ্কায় অনেক সময় তাঁহার তেমনই তীব্রজ্বালা হইত। বলা বাহুল্য, যুবরাজ এরূপ সুন্দরী ও গুণবতী স্ত্রী পাইয়া স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঈর্ষাতুরা জননী দম্পতির মধ্যে এইভাব সুচক্ষে দেখেন নাই। এটুকু ওটুকু লইয়া তিনি বউরাণীকে সর্ব্বদাই ভর্ৎসনা করিতেন;—এমন কি সখী ও দাসীদিগের কাছেও অপমান করিতেন। স্বামীসোহাগিণী

তাঁহার স্বামীর আদরে এতই সুখী ছিলেন যে, এই সকল ভর্ৎসনা বা কটুবাক্য তাঁহার মনে কোন দাগ রাখিয়া যাইত না। তিনি কোনদিন ঘুণাক্ষরেও এই অপমানের কথা স্বামীর কাণে তুলিতেন না। এমন কি, সখীরা যদি প্রসঙ্গক্রমে এই সকল কথা লইয়া ঈষৎ আলোচনা করিত, তবে তিনি বিরক্তির স্বরে বলিতেন,—"তিনি বলিবেন না তো কে বলিবে? আমাকে ভাল মন্দ বলিবার আর কে আছে? জানিস্, গুরুজনের কটুক্তি আমার আশীর্ব্বাদ, তাহাতে আমার পাপ খণ্ডিয়া যায়। তোরা এ সকল কথা লইয়া কোন আলোচনা করিতে পারিবি না।"

কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর এই ব্যবহারের সঙ্গে অন্য একটি পরিস্থিতি গুরুতর হইয়া উঠিল। বজ্রধ্বজের কন্যার সঙ্গে কুমারের বিবাহের পর রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা অবশ্য বাড়িয়া গেল। মহারাজ তাঁহাকে মন্ত্রীর পদ দিয়া গৌরব বাড়াইয়াছিলেন। তিনি অন্তঃপুরে এখন অবাধে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় দুশ্চরিত্র ছিলেন। অন্তঃপুরের একটি বনমল্লিকা বা কুন্দের মত শুভ্র বেশধারিণী, অতি পবিত্র দেব-নির্ম্মাল্যের ন্যায় সদ্য বিধবার রূপ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই রূপের মোহ ক্রমশঃ বাড়িয়া গেল এবং এই দৃষ্টি হইতে এড়াইবার জন্য বিধবা বউরাণী যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার লোলুপতা বাড়িয়াই চলিল। এদিকে মন্ত্রী মহারাণীর নিকট গরুড় পক্ষীর ন্যায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিতেন। রাজবাড়ীর সকলেই তাঁহার সৌজন্যে মুগ্ধ

হইয়াছিলেন। বাহিরে অবশ্যই তাঁহার চরিত্রহীনতা সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা প্রচারিত ছিল, কিন্তু রাজবাড়ীর লোকেরা তাহা বিশ্বাস করিত না। বিধবা বউরাণীর প্রতি মহারাণীর বিরূপতা বাড়িয়া গিয়াছিল। এমন কি, যুবরাজের অকাল মৃত্যুর জন্য তিনি তাঁহাকেই দায়ী করিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে অপয়া মনে করিতেন। বিধবা রাণী প্রায়ই তথাগতের একখানি মূর্ত্তির পাশে বসিয়া ধ্যান ধারণা করিতেন; সেখানে বজ্রধ্বজ উঁকি ঝুঁকি মারিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতেন। এদিকে তিনি মহারাণীকে আসিয়া বলিতেন,—"বিধবা রাণীর হিন্দুর ছোঁয়াচে রোগ এখনও পূরা-মাত্রায়ই আছে, আমাকে তাঁহার মন্দিরের পার্শ্বে দেখিলেই তিনি চটিয়া উঠেন।"

এইরূপ ব্যবহার ক্রমে দুঃসহ হইয়া উঠিল। রাজপ্রাসাদের ভিন্ন মহালের ভিন্ন সিঁড়ি থাকা স্বত্বেও মন্ত্রী মৃত যুবরাজের অন্দর বাড়ীর উপর-তলায় সিঁড়ি দিয়া দোতলায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কোন সময় বিধবা বউরাণীর আঁচলের সঙ্গে তাঁহার সংস্পর্শ ঘটিত, স্বর্ণমঞ্জরীর চক্ষু আরক্ত হইত এবং পরক্ষণেই তাহা অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। যেখানে ছোটরাণী ও স্বর্ণমঞ্জরী একত্র বসিয়া কথোপকথন করিতেন, মন্ত্রী সহসা বিধবা রাণীর গা ঘেঁসিয়া তথায় দাঁড়াইতে যাইতেন। বিরক্তির সহিত তিনি স্থান ত্যাগ করিলে অমনই মন্ত্রী যাইয়া মহারাণীকে বলিতেন,—"আমি কৈবর্ত্ত বলিয়া ইনি সকলের সম্মুখে আমাকে যেরূপ অবজ্ঞা করেন, তাহাতে রাজবাড়ীর অন্দর মহলে প্রবেশ আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।"

মহারাণী মহাক্রোধভরে স্বর্ণ নূপুর বাজাইয়া রাজার নিকট যাইয়া তিলকে তাল করিয়া বর্ণনা করিতেন। রাজা বলিতেন,—"সদ্য বিধবা উহার মন কি ঠিক আছে? ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচলিত হইয়া পড়েন।"

হাতের কঙ্কণের ঝঙ্কারে একটা রণদামামার স্বর বাজাইয়া তিনি বলিতেন,—"তোমার বিচারই এইরূপ। আমাদের পরম আত্মীয় এই লোকটি; উঁহার মেয়েটিকে কি দেখিতে ইচ্ছা হয় না? তোমাদের রাজবাড়ীর যে কি ঢালাই-করা লৌহের বিধান বিধিবদ্ধ হইয়া আছে, একবার যে বধূবেশে এ পুরীতে প্রবেশ করে, তাহার ভাগ্যে পিতামাতার বাড়ীতে সহজে যাওয়ার উপায় থাকে না! তাই বলিয়া বাৎসল্য তো পিঠালির আলিপনার মত সহজে মুছিয়া ফেলা যায় না। এইজন্য সময়ে-অসময়ে মন্ত্রী মেয়েটিকে দেখিতে আসেন; তাহাতে যদি প্রতিদিনই তিনি এইরূপ অপমানিত হ'ন, তবে আর কি করিবেন? এ বাড়ীতে আসা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

ক্ষুব্ধ হইয়া রাজা বলেন,—"তুমি মৃদুভাবে উঁহাকে একটু বুঝাইয়া বলিতে পারো; বৌমাকে ত' তেমন অবুঝ বলিয়া আমার মনে হয় না।"

ক্রোধকম্পিত স্বরে রাণী বলেন,—"আমি বহু বুঝাইয়াছি, কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'; কামারের রাত দিনের ঠক্‌ঠক্, কিন্তু কাঠুরের এক ঘা। তুমি যদি একটু বিরক্তি প্রকাশ কর, তবে সাধ্য কি যে এই মেয়ে এরূপ ব্যবহার করিতে উৎসাহ পায়!

যে বিবাহের অল্পদিনের মধ্যে স্বামীকে এমনভাবে খাইয়াছে, তাহার এই সকল দুর্ব্ব্যবহার আমি কিছুতেই সহ্য করিব না। তুমি ইহার জন্য ভিন্ন প্রাসাদের বন্দোবস্ত করিয়া দাও। আর এ বাড়ীর মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, মন্ত্রীর কোন দোষ আছে কিনা।"

রাজা—"আমি কি খোকাকে একঘরে' করিয়া দিব? তাহা হইলে আমি কি লইয়া বাঁচিব?"

মহারাণী—"কেন, খোকা তোমার ও আমার কাছে থাকিবে। আমাদের কাছে কি কিছু কম আদর পাইতেছে?"

রাজা—"পিতৃহারা একটুখানি ছেলে, ইহাকে মাতৃক্রোড় হইতে বঞ্চিত করিব?"

রাণী—"বউকে তাড়াইয়া দিতে বলিতেছি না। তাহাকে কি একটু শাসন করাও তোমার পক্ষে সম্ভবপর নহে?"

মহারাণীর চীৎকার, ফুৎকার ও অবিরত উচ্ছ্বসিত কান্নার জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া রাজা সেদিন যথাসম্ভব সৌজন্য ও স্নেহের স্বরে যাহা বলিলেন, তাহাতে কোনদিকে কাহারও উপকার হইল না। রাণী ভাবিলেন, তাঁহার ক্ষত স্থানের জ্বালা দূর করা দূরের কথা, রাজা যেন অপরাধীর মত বিধবা রাণীরই মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। তিনি নিরাশ হইয়া মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে স্বর্ণমঞ্জুরী মন্ত্রীর ব্যবহারে এরূপ মর্ম্মাহত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, স্বামীকে স্মরণ করিয়া তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল, এবং যে রাজা তাঁহার দিকে শোকে চাহিতে

সাহসী হন নাই, নিজের চোখের জল সামলাইতে না পারিয়া বালকের মত ভাঙ্গিয়া পড়িতেন, সেই রাজার মুখে অকারণ গঞ্জনা, তাহা যতই বিনয় ও স্নেহের স্বরে কথিত হইয়া থাকুক না কেন, তাঁহার হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, তিনি বিষ খাইয়া এই দুর্ব্বিষহ জীবনের শেষ করিতে পারিলেই ভাল।

কিন্তু ঘটনার গতি ইহা হইতেও দূরে গড়াইল। মন্ত্রী যখন দেখিলেন, রাজবাড়ীর সকলেই তাঁহার প্রতি অনুকূল, এবং স্বর্ণমঞ্জুরী লজ্জায় জড়িত, এখন যদি তিনি একটু দুঃসাহসের কাজ করেন, তবে লজ্জার দরুণই হোক্, বা অপমানের হাত হইতে আত্মসম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যেই হোক্, বিধবা রাণী তাহা সহিয়া লইবেন। অনেক সময় পুরুষ ব্রীড়াজড়িত পদে অগ্রসর হইলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না,—তাহাকে একটু ভয় ভাঙ্গাইতে হয়। সেইদিন ছোট কুমার তাঁহার এক বন্ধুর সঙ্গে বনভ্রমণে গিয়াছিলেন। এই সুযোগে মন্ত্রী তাঁহার মেয়ের গৃহে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থাকিয়া স্বর্ণমঞ্জুরী দেবীর আনাগোনার পথে ওঁৎ পাতিয়া ছিলেন। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী মহাল হইতে বিধবা রাণীর কপাট খুলিবার শব্দ শুনা মাত্র তিনি বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন, বউরাণী বাহিরে যাইতেছেন। তখন হঠাৎ আলো নিভাইয়া তিনি তাঁহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিলেন। স্বর্ণমঞ্জুরীর চীৎকারে অন্তঃপুরিকারা সকলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মন্ত্রী তাঁহার চোখে-মুখে জল সিঞ্চন করিতেছেন। বিধবা বউরাণী

চীৎকার দিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। মন্ত্রী বলিলেন,—"আমি ছোটরাণীর ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইব, এমন সময় এই মহালে চীৎকার শুনিয়া আসিয়া দেখি ইনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছট্ফট করিতেছেন। তজ্জন্য চোখে-মুখে জল সিঞ্চন করিতেছি।"

মহারাণী বলিলেন,—কি জানি বাপু, ইহার একি লীলা খেলা! এখানে সুরক্ষিত রাজবাড়ীর মধ্যে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানা কে আসিবে জানি না। যাহা হোক্ ইঁহার জ্ঞান হইয়াছে, ঐ দেখ ঘোমটা টানিয়া দিয়াছেন। উঁহাকে ঘরে পালঙ্কে শোওয়াইয়া দুইজন পরিচারিকা হাওয়া করিতে থাক্। ঘুম যদি না হয়, তবে রাজবৈদ্য শিবদাসকে খবর দিও। বেহাই মহাশয়, এত রাত্রে আপনার কি দুর্দ্দৈব! আপনি বাড়ীতে যান, আর এখানে রাত্রি জাগরণ করিয়া ক্লান্ত হইবেন না।"

তাহার পরদিন স্বর্ণমঞ্জরী সারাদিন বসিয়া ভাবিলেন, তাঁহার কর্ত্তব্য কি। দশচক্রে ভগবান্ ভূত। এই মন্ত্রী যেরূপভাবে রাজ-অন্তঃপুরে আসন গাড়িয়া বসিয়াছে, তাহাতে আমার সত্যোক্তি ও প্রতিবাদের কোন মূল্যই থাকিবে না। অবশেষে জাতিধর্ম্ম খোয়াইয়া আমাকে সকলই বহন করিতে হইবে। আমার ত প্রাসাদে স্থান নাই,—যুবরাজের সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল দাবী-দাওয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাকে আজই

এই পাপ গৃহ ছাড়িতে হইবে। খোকার বয়স প্রায় দুই বৎসর। ইহার জীবন একেবারেই নিরাপদ নহে। ছোটকুমারের পরে খোকারই যুবরাজ হওয়ার কথা; চিরাগত দেশাচার পালন করিলে এবং রাজ-তক্তের রীতি রক্ষা করিলে যৌবরাজ্যের উপর খোকারই দাবী প্রধান। কিন্তু মন্ত্রী ইহাকে মারিয়া ফেলিবে। এ কণ্টক সে কখনই রাজবাটীতে রাখিতে দিবে না। সুতরাং এখানে আমার ধর্ম্ম রক্ষা হওয়ার উপায় তো নাই-ই,—খোকার জীবন তদপেক্ষাও আপদ-সঙ্কুল। যদি খোকা কাঠ কাটিয়াও খায়, সুস্থ থাকে ও ধর্ম্মের দিকে মতি গতি থাকে, তবে তাহাই মঙ্গল। অবশ্য বৃদ্ধ রাজা ইহার বিচ্ছেদে কষ্ট পাইবেন; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার চক্ষুর স্বাভাবিক দৃষ্টি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শোকে, দুঃখে ও মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ইনি চক্ষুষ্মান্ হইয়াও চক্ষুহীন। সুতরাং ইঁহাদের হাতে আমার সোণার পুতুলটিকে রাখিয়া যাইতে পারি না।”

খোকার গলায় হীরাজড়িত একটা বড় সোণার মাদুলী ছিল। সম্পূর্ণরূপে নিরাভরণ হইয়া তিনি সেই দিনই রাত্রি একটার সময়, যখন ধরিত্রী নিদ্রামগ্ন, কালো রঙের মত রাশি রাশি অন্ধকার আকাশের গায় কেহ যেন লেপন করিয়া দিয়াছে, যখন অশ্বত্থ, শাল, পুন্নাগ হইতে ক্ষুদ্র ফুলের গাছ ও লতাটি পর্য্যন্ত মসীলিপ্ত হইয়া এক বর্ণ হইয়া গিয়াছে,—আকাশে নক্ষত্র ছাড়া আর দেখিবার কিছুই নাই, গ্রীষ্মকালের সেই মাঝামাঝি সময়ে সূচি-ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে নিরাভরণা, সুন্দরী স্বর্ণমঞ্জরী স্বীয় ক্ষীণ শাড়ীর আঁচলে খোকাকে ভাল করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া অতি দ্রুত

পদক্ষেপে সাভারের রাজবাটী ছাড়িয়া চলিলেন। প্রশস্ত পথ, দুইধারে আম ও কাঁটালের বাগান। নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে রক্তবর্ণ সীঁথির মত লাল মাটির পথটি দেখা যাইতেছে,—কখনও বন্য টগর বা বাতাবি ফুলের গন্ধ আসিতেছে,—কখনও চন্দন-গন্ধ-বাসিত বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। এ যেন শুধু কালো রঙের রাজ্য, এ যেন শুধু বিবিধ গন্ধের রাজ্য, একটি ফুলও দেখা যায় না, কিন্তু ফুলের গন্ধে বায়ু ভরপূর। সময় সময় নেকড়ে বাঘ মেষ-ছানাকে মুখে করিয়া রাণীর পথের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাইতেছে। রাণী নির্ভীক, "আমার জীবনের কোন প্রয়োজন নাই, খোকার জীবনেরই বা প্রয়োজন কি? না হয় হস্তিদন্তখচিত স্বর্ণ খট্টায় শুইয়া শত্রু হস্ত-দত্ত বিষের দুঃসহ জ্বালায় যন্ত্রণা পাইতে পাইতে মরিবে, নতুবা তাহার জননীর ক্রোড়ে শায়িত হইয়া ব্যাঘ্রের দন্তাঘাত প্রাণ দিবে। হাঃ যুবরাজ! মহারাজ ভীমসেনের বংশধর সোণার প্রদীপের এইভাবে নির্ব্বাণ হইবে! কিন্তু তুই এক রাত্রি কোন ভাবে কাটাইলে হয়ত খোকা বাঁচিয়া যাইতে পারে; হয়ত অচেনা হইয়া জঙ্গলে কাঠ কুড়াইয়া খাইবে, নতুবা লাঙ্গল চালাইয়া ধানের বীজ বপন করিবে ও ঘরে যাইয়া পাকা ফসল গোলায় জমা দিবে, মন্দ কি?" এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে রাণী চলিতেছেন, দুই চোখের জলে গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যাইতেছে—"আমি না একদিন যুবরাজের সুদর্শন, দৃঢ়-গঠিত, অথচ পুষ্প-শয্যার মত সুকোমল বক্ষে স্থান পাইতাম! আমার হাত হইতে খোকাকে নিজের কাছে লইয়া গিয়া তিনি

উহাকে সোহাগে সোহাগে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেন! হায়, অবস্থার কি নিদারুণ বিপর্য্যয়!" আঁধার পথে একা রমণী। সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ী ছাড়িয়া তিনি কখন শ্রীপুর আসিয়াছেন, কখন শিশুপাল রাজার আম-কাঁটালের গড় ও বোধিসত্ত্বের বিশাল আকাশ-চুম্বী মন্দির ছাড়াইয়া শ্রীপুর, চাঁদনা ও পরে চৌরায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। সুকোমল চরণদ্বয় কণ্টক-বিদ্ধ, পদত্বক্ যেন অবশ হইয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহার গতির বিরাম নাই। তাঁহার দেহ যেন একটা যন্ত্র। মন্ত্রী ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহাকে ধরিয়াছিল, সেই ধরার ফলে তাঁহার চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার দেহের সুখ-দুঃখ-জ্ঞান নাই। চৌরার নিকট কাপাসিয়ায় আসিয়া তিনি দেখিলেন, পূর্ব্বাকাশে লাল রং দেখা দিয়াছে—যেন সপ্তাশ্বযোজিত সুবর্ণ-রথে চড়িয়া দিনমণি আসিতেছেন। সেই রথের উর্দ্ধে অরুণের আভা যেন একখানি রক্ত পতাকা। প্রভাত-বায়ু নিকটস্থ তড়াগের পদ্মবন হইতে সুরভি কুড়াইয়া তাঁহার মুখ কোমল ভাবে স্পর্শ করিতেছে এবং খোকার নিদ্রা গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছে।

ক্রমশঃ দশদিক পাহাড়িয়া দেশের নানারূপ পাখীর কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। রাজবধূ স্বর্ণ-খচিত পিঞ্জরার মধ্যে আবদ্ধ পাখীর ডাক শুনিয়া অভ্যস্ত। কিন্তু আজ এই মুক্ত পাহাড়িয়া দেশের নানা পাখীর স্বর কি না মিষ্টই শুনাইতেছে! যেন এক-খানি বীণার তার অবাধ আনন্দে বাজিতেছে ও মেঘের স্তর

হইতে,—বৃক্ষচূড়া হইতে ও ঝোপ জঙ্গলের মধ্য হইতে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও উদাত্ত স্বরের ধ্বনি হইতেছে। রাজবধূ বুঝিলেন, যেন প্রকৃতি-দেবী মায়ের মত তাঁহাকে বিচিত্র ভাষায় আদর করিতেছেন, যাদু-স্পর্শ দ্বারা তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। সহস্র কষ্টের মধ্যেও তিনি এই পাহাড়ের জঙ্গলে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিলেন।

তাঁহার প্রথমে দেখা হইল একজন বৃদ্ধ মহিষপালের সঙ্গে। তাহার বয়স প্রায় আশি,—একটি দাঁতও নাই, মাথার চুল সমস্তই উঠিয়া গিয়াছে। একেবারে বিরলকেশ মাথাটি একটি বড় তরমুজ বা কুমড়ার মত দেখাইতেছে। প্রভাত-সূর্য্যের আলো পড়িয়া মাথাটা চিক্ চিক্ করিতেছে—হস্তের শিরাগুলি শিথিল, তাহার উপর কেহ যেন আল্‌গা ভাবে চামড়া আটকাইয়া রাখিয়াছে। এই লোকটি বহু কষ্টে একটি খুঁটি পুতিয়া লম্বা একটা দড়ি দিয়া মহিষটাকে বাঁধিল, তাহার পর পশ্চিমের পথ ধরিয়া নিকটবর্ত্তী পল্লীর দিকে আসিতে লাগিল। তাহার সম্মুখেই স্বর্ণমঞ্জরী, তাঁহার শিশুটি আঁচলে ঘেরা। তিনি তাঁহার কুঞ্চিত কেশরাশি আসিবার সময় কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। তথাপি সে কি রূপ! ভস্মের মধ্যে যেমন স্ফুলিঙ্গ সহসা দীপ্তি পায়, সে ক্ষীণ বসন ও আভরণহীন দেহ হইতে তাঁহার রূপের প্রভা বাহির হইয়া তেমনই সূর্য্যালোকের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল।

স্বর্ণমঞ্জরী নিজেই অগ্রসর হইয়া মহিষপালককে বলিলেন—"আমি বড় বিপন্ন, আমার এই শিশুটি সারা রাত্রি কিছুই খায়

নাই। তোমার বাড়ীতে বাবা, আমি দুই এক দিনের জন্য আশ্রয় পাইতে পারি কি?”

করজোড়ে বৃদ্ধ বলিল—“আপনি কে আমি জানি না, আমার চক্ষে আপনি স্বয়ং লক্ষ্মী-স্বরূপা। লক্ষ্মী নিজে যাচিয়া আমার কাছে আশ্রয় চাহিতেছেন, ইহা হইতে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমি আর ঐ মোষটি ছাড়া আমার বাড়ীতে আর কেহই নাই। ঐ যে দোচালা খড়ের ঘর, উহাতে বাঁশের বেড়া দিয়া দুইটি প্রকোষ্ঠ করা হইয়াছে, উহার বড় খানিতে মা লক্ষ্মীর অবস্থান হইবে। আমার জ্ঞাতি এক ভ্রাতার দুগ্ধবতী গাভী আছে। সে বিদেশে গিয়াছে। তাহার কুঁড়ে ঘর খানিও আমার কুটীরের সঙ্গে লাগাও। সেই গাইটার ভার আমার উপর দিয়া গিয়াছে, তাহার প্রচুর দুধ হয়। আপনার ছেলের দুধের অভাব হইবে না।”

বউ-রাণী কহিলেন—“বাবা, আমার একটা প্রকোষ্ঠ দিয়া কি হইবে? তোমার কুঁড়ের বারান্দায় খড় পাতিয়া আমার ছেলের সঙ্গে সুখে থাকিব। আমার এই আশ্রয়টুকু হইলেই যথেষ্ট হইবে।”

স্বর্ণমঞ্জরী দুই এক ঘণ্টার মধ্যে গোশালার মার্জ্জনা শেষ করিয়া মহিষের ঘরটিও সাফ্ করিলেন। তাহার পর নিজ হাতে বুড়োর প্রকোষ্ঠ দুইটিকে ঝক্‌ঝকে করিয়া জমি হইতে কচি বেগুন, আলু ও লাউ তুলিয়া লইয়া আসিয়া মোষের দুধের দই এবং গরুর দুধের ক্ষীর তৈয়ারী করিলেন। মহিষপালক তাহার খেজুর

গাছ হইতে রস বিক্রয় করিয়া তাহার বিনিময়ে গুড় পাইয়াছিল। মহিষাল তাঁহার হাতের রান্না খাইয়া বলিল,—"জীবনে এমন সুস্বাদু অন্ন-ব্যাঞ্জন খাই নাই।" খাইবার পূর্ব্বে সে বলিয়াছিল, "মা আগে তুমি খাও, তবে তোমার এই দাস মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ পাইবে।"

ছেলেকে দুধ খাওয়াইয়া খড়ের বিছানায় শোয়ান হইল। বউরাণী কহিলেন,—"আমার বড় জ্বর হইয়াছে, আজ আর আমি কিছুই খাইব না।"

স্বর্ণমঞ্জরী মহিষপালকের নিকট হইতে একটুকু কাগজ, কালি ও কলম চাহিলেন। সম্মুখেই গয়লাদের পুরোহিত-বাড়ী। বুড়ো তথা হইতে সে সকল সংগ্রহ করিয়া দিয়া মহিষ চরাইতে ক্ষেতের দিকে চলিয়া গেল। রাণী তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার মত অক্ষরে সেই পাত্‌লা কাগজের চারি পৃষ্ঠা ভরিয়া কি যেন লিখিলেন। তাহার পর শিশু-কুমারের সোণার পদকের একদিকের সোণা উঠাইয়া ফেলিয়া গালাগুলি তুলিয়া ফেলিলেন এবং সেই লিখিত কাগজখানি পুরিয়ার মত করিয়া তদ্বারা গালার স্থানটি ভর্ত্তি করিলেন। অবশেষে পদকের ছিদ্রটি প্রদীপ জ্বালিয়া অগ্নির উত্তাপে জোড়া দিয়া বন্ধ করতঃ পুনরায় শিশুর গলায় দোলাইয়া দিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইলেন এবং একান্ত অবসন্ন হইয়া খড়ের বিছানায় এলাইয়া পড়িয়া নিদ্রাক্রান্ত হইলেন।

বেলা-অবসানে বৃদ্ধ কৃষক গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার অতিথির ঘুম ভাঙ্গে নাই এবং শিশুটি স্খলিত কোমল হস্তে মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। বৃদ্ধ

ধীরে ধীরে তাঁহাকে ডাকিল। সেই ডাকে রমণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সদ্যঃ জাগ্রত চোখ দুইটি রক্তবর্ণ, তিনি বলিলেন—"আমার বড় জ্বর হইয়াছে। আমি চোখ মেলিতে পারিতেছি না। সাঁঝের দীপ জ্বালিতে পারি নাই এবং তোমার জন্য রান্নাও চড়াইতে পারি নাই। বাবা, আমার মনে হইতেছে, আমার আসন্নকাল উপস্থিত। আমি শুনিয়াছি, শ্রীপুরের অবলোকিতেশ্বরের মঠ এখান হইতে দূরবর্ত্তী নহে। আপনি সেই মঠ হইতে দুই একজন সন্ন্যাসী আনিয়া তাঁহাদের উপর আমার ভার দিন। নতুবা আমাকে লইয়া বিপন্ন হইবেন।"

অবলোকিতেশ্বরের মঠ বাস্তবিকই অতি নিকটে। বর্ষীয়ান্ কৃষক তখনই আশ্রম হইতে দুইজন সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হিন্দুস্থানী, খর্ব্বাকৃতি, নাসিকা উন্নত নহে,—বরং কিছু চেপ্টা, তাঁহার বয়স বেশী। দ্বিতীয়জন বাঙ্গালী, দীর্ঘাকৃতি, আয়তলোচন, সুগঠিত, সুঠাম দেহ। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কিছু উর্দ্ধে হইবে। বউরাণী সেই বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া কাছে ডাকিলেন এবং অপর সকলকে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলেন।

সন্ন্যাসী তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপনার বেশী সময় নাই। ক্রমাগত দেহ নির্য্যাতনের ফলে আপনার ত্রিদোষ-যুক্ত জ্বর হইয়াছে। আর দুই ঘণ্টা কাল আপনি বাঁচিবেন কিনা সন্দেহ।"

অতি ক্ষীণস্বরে রাণী কহিলেন—"এই নশ্বর দেহের পতন

হইলেই আমার সৌভাগ্য। পুষ্প-কলিকার ন্যায় আমার স্বামীর স্নেহের দুলাল, ধর্ম্মের প্রসাদ এই শিশুটিকে আপনাকে দিয়া গেলাম। ইহাকে আপনি পুত্রবৎ পালন করিবেন এবং আপনার পুত্রস্থানীয় বলিয়াই পরিচয় দিবেন। ইহার বংশ, বা আমার জীবন-সম্বন্ধে আপনি কিছু জানিতে ঔৎসুক্য দেখাইবেন না। সেরূপ অহেতুক ঔৎসুক্যের কারণ নাই। ইহার ভার আপনি গ্রহণ করিলে, আপনার পক্ষে কোন লজ্জার বিষয় হইবে না। আপনি আমার মৃত্যুকালীন এই উক্তির সমস্তই বিশ্বাস করুন। এই জ্যৈষ্ঠমাসের ১৫ই তারিখে কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে ইহার বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হইবে। যে দিন ইহার বয়স ২৪ বৎসর পূর্ণ হইবে, সেই দিন ইহার গলার মাদুলী ভাঙ্গিয়া আপনি একটা লিখিত কাগজে ইহার ও আমার সমস্ত বিবরণ পাইবেন। তৎপূর্ব্বে মাদুলী ভাঙ্গিবেন না। আপনি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিন। আমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আপনি এই সকল সর্ত্তে ইহার ভার লইলেন জানিলে আমি সোয়াস্তির সহিত মরিতে পারিব।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমরা গৃহাশ্রমী নহি। সুতরাং জাতি-বর্ণ প্রভৃতি কোন বিষয়েই আমাদের বিচার করিবার প্রবৃত্তি নাই। আমি আপনার প্রদত্ত এই ন্যাস আপনার কথিত সর্ত্তে গ্রহণ করিলাম।"

তাহার পর সেই জীর্ণ কৃষক কুটীরে সাভারের কুলোজ্জ্বলা, অনুপমা সুন্দরী জ্যেষ্ঠা রাজ-বধূর প্রাণ আকাশে মিশিয়া গেল। সাভার রাজ্যের চোখের দুলাল, বহুকষ্ট—বহু তপস্যা-লব্ধ

মাণিকটিকে সন্ন্যাসী লইয়া গেলেন। অবলোকিতেশ্বরের মঠের সংলগ্ন একটি খালের নিকটস্থ শ্মশানে স্বর্ণ-প্রতিমা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কেবল সেই বৃদ্ধ কৃষক তাহার মা লক্ষ্মীকে হারাইয়া সেই শ্মশানের উপর বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার বুকের ব্যথা লাঘব করিত। অন্য সকলে স্বর্ণমঞ্জরীকে সামান্য রমণী মনে করিয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধ কৃষক তাঁহাকে মা-লক্ষ্মী বলিয়াই জানিয়াছিল! বহু পুণ্যের ফলে এক দিনের জন্য তাঁহাকে পাইয়াও তাহার জন্ম-জন্মকৃত শত অপরাধের জন্য তাঁহাকে রাখিতে পারে নাই,—এই বদ্ধমূল ধারণায় সে কত পরিতাপ করিত।

নয়

"ধূ ধূ ধম্ ধম্ ঝাঁ ঝাঁ ঝম্ ঝম্
দামামা দম্‌দম্ বাজে।
হুড়্ হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ দুড়্
কামানের গোলা গাজে॥
* * * * * * *
হান হান হাঁকে খেলে উড়া পাকে
পাইকে পাইকে যুঝে।
কামানের ধূমে তমঃ রণভূমে
আত্ম পর নাহি শুঝে॥"

—ভারতচন্দ্র।

সেনাপতি ও শ্যামলের সঙ্গে দুর্জ্জয় সেন যুদ্ধ-সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছেন।

সেনাপতি বলিলেন—"মহারাজ, যুদ্ধ আসন্ন। আমি চারিদিকে রণ-ডঙ্কা বাজাইবার আদেশ দিয়াছি। এখন প্রায় দুইলক্ষ সেনা রণ-শিবিরে উপস্থিত হইয়াছে। দুলো কৈবর্ত্তের অধীনে কুড়ি হাজার সৈন্য আছে,—সে সমস্ত নৌবল একত্র করিয়াছে। আমাদের ডোম সৈন্য ও হাড়ি চণ্ডাল পদাতিক যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ, সাভারের কিরাতেরা তেমনই দুর্জ্জয়। তাহাদের কৈবর্ত্ত মাঝিরা জলযুদ্ধে মজবুত; কালাপানিতে আমাদের মতই তাহারা শত যুদ্ধের যোদ্ধা। এখন মহারাজ, হুকুম দিন,—আমরা কি বাজাসন হইতে কিছু পূর্ব্বে যাইয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিব, না আমরাই অগ্রসর হইয়া প্রথম আক্রমণ করিব?"

সহ-সেনাপতি তরুণ শ্যামল বলিল—"আমার মনে হয়, আমাদেরই ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়া অগ্রে অভিযান করা দরকার। তাহারা যদি প্রথম ধলেশ্বরীর এপারে আসিতে পায়, তবে বাজাসন বিহারের উপর তাহারা যেরূপ বিদ্বিষ্ট, এটি তাহারা আসিয়া ধ্বংস করিবে, তাহার পরই রাজবাড়ী। সুতরাং আমাদিগকে তাহাদের প্রথম আক্রমণের সুযোগ দেওয়া উচিত হইবে না।"

রাজা—"আমার মনে হয়, শ্যামল ঠিকই বলিয়াছে। এই যুদ্ধ এত তাড়াতাড়ি লাগিয়া গেল যে, আমরা রাজবাড়ীর অন্তঃপুরিকা ও এই অঞ্চলের শিশু, মহিলা, দরিদ্র, অন্ধ আতুর

প্রভৃতি প্রজাদিগকে রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করিবার সময় পাই নাই! যদি আমার সৈন্যেরা কয়েক মাস তাহাদিগকে ধলেশ্বরীর বক্ষে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে, এমন কি তাহাদের রাজধানী আক্রমণ করিয়া কিরাত-পল্লীতে তাহাদিগকে ব্যাপৃত রাখিতে পারে, তবে যুদ্ধে অশক্ত স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদিগকে আমরা নিরাপদ স্থানে দূরে পাঠাইবার সময় পাইব। আমাদের অন্তঃপুরের নারী-রক্ষীরা এবং কোচ ও তেলেগু জাতীয় মেয়েরা খুব ভাল তীরন্দাজ। ইহারা অশক্তদিগকে লইয়া ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হইবে। ভগবান্ না করুন, প্রয়োজন হইলে ধন-সম্পদেরও অনেকটা আমাদের টাঙ্গাইলের দৃঢ় দুর্গে নিরাপদে পৌছাইতে পারিব। আর একটা কথা,—মন্ত্রী মহাশয় অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, বিশেষতঃ আমাদের একজনের রাজধানীতে থাকা দরকার; কিন্তু আমি যুদ্ধকালে তোমাদের পুরোভাগে থাকিব।"

শ্যামল—"সে হইতেই পারে না। মহারাজও বয়োবৃদ্ধ; বিশেষতঃ যুবরাজ তরুণ হইলেও আমি তাঁহাকে এমনভাবে তৈয়ারী করিয়াছি যে, তিনি এখনই যুদ্ধে নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। খুল্লতাত মহাশয় ও আমি জীবিত থাকিতে তাঁহার জন্য কোনই আশঙ্কা করিবেন না।"

এই ব্যবস্থাই পাকা হইল। আষাঢ় মাস না পড়িতেই যুদ্ধ-ডিঙ্গাগুলি লইয়া দুলু কৈবর্ত্ত ধলেশ্বরী ও ব্রহ্মপুত্রের মুখে যাইয়া পৌছিল। এই ডিঙ্গাগুলি অতি বৃহৎ। প্রাগ্ ঐতিহাসিক

অতিকায় জন্তুদের মত এক একটির আকৃতি। প্রথম ডিঙ্গার সম্মুখে স্বর্ণ-ফলকে "সিংহ-মুখ" নাম অঙ্কিত; তাহার গলুইটি সুদৃশ্য কেশরযুক্ত সিংহমুখের আকৃতি। "সিংহমুখ" পঞ্চাশটি কামানে ভর্ত্তি। তাহার পরের ডিঙ্গা "বুনো মোষ", নামানুসারেই গলুইয়ের গঠন, এবং পূর্ব্ববৎ স্বর্ণফলকে "বুনোমোষ" নাম উৎকীর্ণ। ইহা বারুদে বোঝাই। রক্তবর্ণ দুইটি কাচ-খণ্ডে ইহার দুইটি চক্ষু নির্ম্মিত,—রাত্রির আলোতে উন্মত্ত মহিষের রক্তবর্ণ চক্ষুর মতই দেখায়,—ডিঙ্গির বর্ণও মহিষের গায়ের মত ছাই রং। তৃতীয় ডিঙ্গির একদিক হইতে অন্যদিক যাইতে প্রায় ৮ মিনিট সময় লাগে; এই ডিঙ্গির নাম "গোধিকা"। বলাবাহুল্য বাজাসনের শিল্পীরা যে যে পশুর নাম ডিঙ্গিগুলিকে দিয়াছে, তদনুসারে তাহাদের ভীষণ আকৃতি গঠিত হইয়াছে। এই ডিঙ্গিতে তীরন্দাজ সৈন্যেরা চলিয়াছে। তাহার পরের ডিঙ্গাগুলি খুব দীর্ঘ; তাহার একখানির নাম "সরীসৃপ", অপর একখানির "মকরমুখ", —আর একখানির নাম "হংসরব"। শেষোক্ত এই ডিঙ্গিখানি জলে চলিবার সময় তরঙ্গের মধ্যে বহু হংসের মিলিত কণ্ঠের মত একটা কলরব হয়। প্রায় ষাটখানি ডিঙ্গিভরা পদাতিক সৈন্য: তাহার কোন কোনটিতে পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত সৈনিক। "তিমিঙ্গিল" নামক ডিঙ্গিতে মহারাজার স্বীয় লেঠেলদের স্থান হইয়াছে। "হাঙ্গরে" তীরন্দাজ সৈন্য, "সিন্ধুঘোটকে" বাজাসনের অজেয় ঢালী সৈন্য। কোন কোন ডিঙ্গি বন্দুকে, কোন কোন ডিঙ্গি তীরে পূর্ণ। "রাঘব-বোয়াল" ডিঙ্গিতে ধনুকধারী

সৈন্যেরা ঘোর কলরব করিয়া চলিয়াছে। পদাতিকদের অনেকের মুখে লৌহের মুখোস পরা! মুখোসগুলি ভূত, প্রেত, দানব ও রাক্ষসের মুখের মত। হস্তে তীক্ষ্ণ বর্শা, কাহারও তদপেক্ষা ক্ষিপ্র, তদপেক্ষা দৃঢ় বাঁশের লাঠি, কৃত্রিম সুদীর্ঘ বক্রাকার গোঁপ ও বিকট-দন্ত রাক্ষসমুখ কালো বর্ণের মুখোসে—এই সকল পদাতিকগণকে দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা যমরাজের দূত।

এই সৈন্যেরা জাভা, সুমাত্রা, বালি জয় করিয়াছে। ইহারা সমুদ্রের পাখীর ন্যায় মুক্তপথের যাত্রী। ইহারা এত দুর্দ্ধর্ষ যে, ইহাদিগকে ঠেকাইতে পারে, এরূপ শক্তি, বাঙ্গালা, কলিঙ্গ ও তেলেগু ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোন স্থানের নৌ-বলের নাই। বলা বাহুল্য, সাভারের কিরাত-সৈন্যেরাও উভচর প্রাণী; তাহারাও জলে, স্থলে চিরজয়ী। সাভারের নৌ-বলেরও প্রধানতঃ কৈবর্ত্ত-নেতা। তাহাদের প্রধানের নাম "প্রচণ্ড"।

দুই পক্ষের নৌবল মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুইদল হইতেই কামান দাগা হইতেছে। বন্দুকের গুলি ও তীরন্দাজের তীর শর শন্ শন্ করিয়া ছুটিয়াছে। যুদ্ধের বাদ্য কাড়া, নাকাড়া বাজিতেছে।

কিন্তু ধলেশ্বরীর তরঙ্গের গর্জ্জনে রণ-দুন্দুভির স্বরও যেন ডুবিয়া গিয়াছে। উভয় দল হইতে নিহত সৈন্য মুহূর্ত্ত মধ্যে সাগর-সঙ্গমে যাইয়া পড়িতেছে, তথা হইতে সহস্র সহস্র শব বুদ্বুদের মত বঙ্গোপসাগরের বক্ষে লীন হইতেছে। সাত দিন সাত রাত্রি অবিরাম যুদ্ধ চলিতেছে। বাজাসনের ডিঙ্গিগুলি তবুও একতিল

অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বদিকে সাভারের রাঙ্গা মাটির পার হইতে নদীর গর্ভে প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত সাভারের রণতরী, মাঝে ফাঁকা, তাহার পর আবার এক মাইল ব্যাপিয়া বাজাসনের নৌবল! "জয় বদর!" বলিয়া বাঙ্গালী নৌ-সৈন্য হাঁকিতেছে। রোসাঙ্গ হইতে আনীত সাভারের কিরাত-সৈন্যরা "ফরা" "ফরা" বলিয়া যুদ্ধ-ধ্বনি করিতেছে। কাহারও মাথার খুলি, কাহারও হাত-পা ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের গ্রাহ্য নাই। একটি সৈন্যের বামহস্ত কামানের গোলায় উড়িয়া যাইতে যাইতে একটু খানি ত্বকে মাত্র আট্‌কাইয়া রহিল। সেই সৈন্য ডান হাত দিয়া বাম হাতটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া একহস্তেই যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা রণোন্মাদনায় মাতিয়াছে, তাহারা যেন সিদ্ধপুরুষ ও যোগীর ন্যায় দৈহিক সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে উঠিয়াছে।

এদিকে যুবরাজ, সেনাপতি ও শ্যামল—তিনজন বহু সৈন্য লইয়া তিনটি "মধুকরে" থাকিয়া এক একটি "গোধুয়া" ডিঙ্গিতে যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। "গোধুয়া" ডিঙ্গির সমস্ত অংশ মহিষের চর্ম্মাবৃত; নৌবাহকদিগের বৈঠা ও হাল চালনার জন্য স্বল্প-পরিসর ফাঁক আছে এবং উহাদের উর্দ্ধে বক্রাকৃতি 'চিম্‌নি' রৌদ্র ও হাওয়ার চলাচল ঠিক রাখিতেছে। মহিষের চর্ম্মের উপর কর্দ্দমাক্ত মাটি এবং তাহার উপর গণ্ডারের চর্ম্ম! "গোধুয়া" গুলিতে একটুও কাঠ নাই—সমস্তই বেতের নির্ম্মিত; সেই বেতের উপর চর্ম্মের ছাউনি। বিপক্ষের গুলি কচিৎ সেই গণ্ডারের চর্ম্মাবরণ ও কর্দ্দমের প্রলেপে প্রবেশ করিতে পারে! তাহার পরও মহিষের চর্ম্ম আছে।

এই সকল বিভিন্ন উপকরণে নির্ম্মিত হইলেও বেতের কাজ এত সূক্ষ্ম ও শক্ত যে, ডিঙ্গিগুলি একান্ত হালকা। যুবরাজ ও তাঁহার দুই সহচর দূরবীণ যোগে যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া সমীপবর্ত্তী 'গোধুয়া' গুলিকে নির্দ্দেশ দিতেছেন। তাহারা তীরের মত বেগে যাইয়া যুদ্ধ-ডিঙ্গিগুলিকে যথাবিহিত উপদেশ জানাইয়া আসিতেছে। কোন কোন "গোধূয়া" লেঠেলে ভর্ত্তি। তাহারা শত্রুর ডিঙ্গিগুলির অবকাশে প্রবেশ করিয়া, লাফাইয়া জলে পড়িতেছে এবং জলের মধ্যে ডুবিয়া তাহাদের মহাশক্তিশালী ভুজপ্রক্ষিপ্ত লাঠির তাড়নায় শত্রুর ডিঙ্গিগুলির তলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। গোধুয়ার অতর্কিত আক্রমণে কত ডিঙ্গা জলের অতল তলে আশ্রয় পাইতেছে।

সাত দিনের পরও দেখা গেল, জয় পরাজয় অনিশ্চিত। অথচ প্রত্যেক দিনই সহস্র সহস্র সৈন্য ক্ষয় হইয়া উভয় দলই তুল্যরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। শ্যামল বলিলেন—"এভাবে আমাদের সৈন্য ধ্বংস করিয়া ফল কি? এতো জয়-পরাজয়ের যুদ্ধ নহে, এ যে শুধু লোক-ক্ষয়ের যুদ্ধ। আমি একটি কথা বলিতে চাই। শত্রুদের বন্দুক ও তীর আছে, তাহার সংখ্যা বেশী হইলেও, সেই সংখ্যার একটা শেষ আছে। ধরুন, সম্মুখে দুই হাজার বন্দুক ও কতকগুলি কামান লইয়া ডিঙ্গির উপর হইতে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উহারা ছুঁড়িতেছে, আমরাও তদ্রূপ করিতেছি, ইহাতে উভয় পক্ষেই লোক মরিতেছে। কিন্তু যদি আমাদের পদাতিক সৈন্যের মধ্যে পাঁচ ছয় হাজার লোক বন্দুক বা ধনুক ব্যবহার না করিয়া প্রচণ্ড বেগে উহাদের উপর যাইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহাদের

বর্ত্তমান বন্দুকধারী ও কামান দাগিবার লোকগুলি এই পাঁচ-ছয় হাজার সৈন্য রোধ করিতে যাইয়া তাহাদের সমস্ত গোলাগুলি ও শর ব্যয় করিয়া ফেলিবে। এই ব্যবস্থা এত দ্রুত ও আকস্মিক ভাবে করিতে হইবে যেন, তাহারা পুনঃ তদ্রূপ সরঞ্জাম সহসা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে না পারে। ইতিমধ্যে আমাদের পঞ্চাশ ষাট হাজার ধনুকী ও বন্দুকধারী সৈন্য হঠাৎ তাহাদের ডিঙ্গির ব্যূহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে একেবারে নিষ্ক্রিয় ও অক্ষম করিয়া ফেলিবে। এই প্রস্তাবের মধ্যে একটা দিকে বিপদ আছে। অগ্রগামী পাঁচ-ছয় হাজার সৈন্যের জীবন রক্ষা কঠিন হইবে, তাহাদিগকে মৃত্যুপণ করিতেই হইবে। সেনাপতি ও যুবরাজ উভয়েই এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। "তবে যে পাঁচ-ছয় হাজার সৈন্য প্রথমে অভিযান করিবে, তাহারা কে? তাহাদের একেবারে মৃত্যুপণ করিয়া রওনা হইতে হইবে।"

শ্যামল বলিলেন—আমি যাইব, যুবরাজও আগ্রহ দেখাইলেন এবং সেনাপতিও তখনই অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন।

ভুলুই কৈবর্ত্ত বলিল—"ইহা আপনাদের কর্ম্ম নহে। আমরা রাজ্য রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। রণক্ষেত্রে মৃত্যুই আমাদের কাম্য, আমরা তজ্জন্য প্রস্তুত। আপনাদের দ্বারা যুদ্ধের আরও বিস্তর কাজ আছে। আপনারা ইচ্ছা করিয়া এখনই জীবন নষ্ট করিলে বৃদ্ধ মহারাজ এখনই শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। যুদ্ধে জয়ী হইবে কে? রাজাসনের উপর আক্রমণ

ঠেকাইবে কে? আমাদের কি শক্তি যে, যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতে পারি।”

তথাপি যুবরাজ ও শ্যামল এই অগ্রযুদ্ধে যাইতে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন ডুলুই কৈবর্ত্ত একটা তীর হাতে করিয়া দাঁড়াইল, তাহার অগ্রভাগ বিষাক্ত। সে বলিল—“নৌ-যুদ্ধের পরিচালক ও নেতা আমি। মহারাজ এই তরুণদ্বয়কে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। আপনারা যদি আমার ইচ্ছা না মানিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করেন, ও রাষ্ট্রের ভিত্ নষ্ট করিয়া ফেলেন, তবে এই বিষাক্ত শর এখনই বুকে বিঁধাইয়া প্রাণত্যাগ করিব।”

সেনাপতি, রাজপুত্র ও শ্যামল এই কথায় নিরস্ত হইয়া গেলেন। সাত হাজার তীরন্দাজ, ঢালী ও পদাতিক সেই অগ্র-অভিযানে যাইবার জন্য বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইল।

অমাবস্যা রাত্রি, উত্তর দিক হইতে হাঁড়িয়া মেঘ উঠিয়াছে। নিবিড় অন্ধকারে আকাশে পাখীগুলির বিষম কলরব আসন্ন ঝড়ের সূচনা করিতেছে। ধলেশ্বরীর বিপুল তরঙ্গ ডিঙ্গিগুলিকে ক্ষণে ক্ষণে গ্রাস করিয়া যেন আবার মুক্তি দিতেছে। তরঙ্গের সে কি ভীষণ আরাব! “অট্টহাস” নামক ডিঙ্গির সমুচ্চ দুন্দুভি-নিনাদ ডুবিয়া গিয়াছে, ঝড় ও তরঙ্গের শব্দে বন্দুকের ধ্বনি বিলীন হইয়া গিয়াছে। কামানের গুম্ গুম্ শব্দ ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ছয় হাজার আগ্নেয় অস্ত্রহীন পদাতিক শুধু ঢাল ও অসি হস্তে একটা শক্তিশেলের মত বিদ্যুত-গতিতে ডিঙ্গি চালাইয়া লইয়া অগ্রসর হইল। শত্রুর ডিঙ্গিগুলি প্রথমতঃ

বুঝিতেই পারিল না, মহাকায় দৈত্যের ন্যায়, একত্র সন্নিবদ্ধ কি একটা পাগ্‌লা মহিষের মত ভীষণ জন্তু দিগ্বিদিক বিবেচনা না করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে বন্দুক ও কামানের গোলা গুলি তাহাদের গতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু যাহারা মৃত্যু-পণ করিয়া আগুয়ান, তাহাদিগকে ঠেকাইবে কে? শত শত সৈন্য মরিতে লাগিল, আবার শত শত অগ্রসর হইতে লাগিল। গুলি গোলার অন্ত আছে, কিন্তু এই মৃত্যু-পণ বীরদের সংখ্যার অন্ত নাই। ক্রমেই শত্রু পক্ষের গুলির সরঞ্জাম হ্রাস পাইল। এই সময় যেন হঠাৎ পর্ব্বত শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শত সহস্র ঢালী, পদাতিক, বন্দুকী, ও তীরন্দাজ জোঁকের মত সাভারের সৈন্যদিগকে ঘিরিয়া ধরিল। তাহারা রাজবাড়ীতে গুলি-গোলা ভর্ত্তি করিয়া আনিতে গিয়াছে; ইহার মধ্যে বাজাসনের কামান ও বন্দুক তাহাদের পথ রোধ করিয়া ফেলিয়াছে। সাত হাজার অগ্রগামী সৈন্যের মধ্যে পাঁচ হাজার মরিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহারাই মৃত্যু দ্বারা তাহাদের বন্ধুদের জয়ের পথ মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে। বিরাট্ গিরি নিঃসৃত ভীষণ বেগ প্রস্রবনের মত এই যে শত শত সৈন্য যাইয়া সাভারের রাঙ্গামাটির উপর উঠিয়া স্বস্তিক চিহ্নযুক্ত বাজাসনের পতাকা প্রোথিত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠে "জয় মহারাজ দুর্জ্জয় সেনের জয়" ঘোষিত হইতে লাগিল, তাহাতে সাভারের মন্ত্রী মহাশয়ের কণ্ঠ ও তালু শুকাইয়া গেল এবং মহারাজ মহেন্দ্র সেন প্রমাদ গণিলেন।

কিন্তু যুদ্ধ এখানেই থামিল না, তাহারা সাভারে উঠিতে

পারিল, এই মাত্র। অচির সময়ের মধ্যে পুনরায় বজ্রধ্বজ কর্তৃক রাজসৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া গঠিত হইল এবং উভয় পক্ষ দিবারাত্রি যুদ্ধ করিতে লাগিল। বাজাসনী সৈন্যেরা সাভারের পল্লীতে পল্লীতে আগুন জ্বালাইয়া দিল। কত অপোগণ্ড শিশু, কত বালক-বালিকা, কত নারী এই আগুনে পুড়িয়া মরিল! বহু কারুকার্য্য-মণ্ডিত অট্টালিকা ও মঠ-মন্দির অগ্নিতে আহুতি পড়িল! পথে ঘাটে দগ্ধ শব। হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ী অর্দ্ধ দগ্ধ! মহিলারা কোথায় পালাইয়া যাইতেছেন;—দস্যুরা কণ্ঠ ও হস্ত হইতে বহুমূল্য জড়োয়া অলঙ্কার কাড়িয়া লইতেছে! যুদ্ধের অপদেবতা ক্ষেপিয়াছে,—শবের উপর শব, শকুণী ও চিলের মেলা, কুকুরেরা রক্তাক্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রের মাটি লেহন করিতেছে;—রক্তের কর্দ্দম ও রক্তের নদী বহিতেছে! চারিদিকে গলিত-প্রায় শবের দুর্গন্ধ! কোথাও বন্দুকীর সঙ্গে বন্দুকীর, লেঠেলের সঙ্গে লেঠেলের যুদ্ধ চলিতেছে। রাজবাড়ীর স্নিগ্ধ পদ্ম-শোভিত টল্ টল্ নির্ম্মল নীলাভ-কৃষ্ণ জল বাজসনীয়েরা বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে। তৃষ্ণার্ত্তের একবিন্দু জল পানের উপায় নাই। গলিত শব এত অধিক যে, ধলেশ্বরীর জল স্পর্শ করিবার উপায় নাই।

তবু যুদ্ধ থামে না। একবার থামে, পুনশ্চ কিরাত-সৈন্য জলহস্তীর মত উত্তর দিক হইতে আসিয়া আবার রণসিন্ধুতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। মোটের উপর প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হইল, তথাপি বাজাসনীয়াদের জয় নিশ্চিত হইল না। বিজয়-লক্ষ্মী যে তাঁহাদের দিকে প্রসন্ন, তাহার একটু আভাষ দেখাইয়া তিনি আবার মুখে ফিরাইতেছেন।

ইহার মধ্যে মহেন্দ্রসেনের এক বিশ্বাসঘাতক্ মন্ত্রী গোপনে সর্দ্দারের সঙ্গে দেখা করিয়া রাজসৈন্য কোথা হইতে কত আসিতেছে, হরিশ্চন্দ্র রাজার কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার কোথায় লুক্কায়িত থাকার সম্ভাবনা, কৈবর্ত্ত সেনাপতির বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে নির্দ্দেশ—এ সকল সংবাদ জানাইতে প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন, যদি যুদ্ধজয়ের পর সাভার রাজ্যের একাংশের অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হয়, এই সর্ত্তে তিনি সমস্ত সন্ধান দিতে সম্মত হইলেন।

সর্দ্দারজি বলিলেন—"আপনি যদি আমাদের সহায়তা করেন, তবে অবশ্য মহারাজ আপনাকে পুরস্কৃত করিবেন। কিন্তু এসকল বিষয়ে কোন নিশ্চিত কথা বলিবার অধিকার আমার নাই। আমি রাজা ও মন্ত্রীর অধীন সেনাপতি মাত্র। অবশ্য যুবরাজ এখানে আছেন, কিন্তু তিনি অতি তরুণবয়স্ক।"

এই অনিশ্চিত আশা পাইয়াও শুধু সেই মন্ত্রীটি নহেন, মহেন্দ্র সেনের কৈবর্ত্ত আত্মীয় এবং তাঁহার দ্বারা অশেষরূপ উপকৃত সুহৃদ্বর্গের কেহ কেহ রাজবাড়ীর ফাঁক ও দুর্ব্বল অংশের ইঙ্গিত দিয়া সুয়াপুরের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আনাগোনা করিতে লাগিলেন।

শ্যামল বলিল—"প্রাচীন হইলে সকল জাতিরই এইরূপ অধঃপতন হইয়া থাকে। তখন যাহার নুন খাইয়া লোকে মানুষ হয়, তাহারই গলা কাটিবার জন্য সেই সকল অকৃতজ্ঞ নরাধম গুপ্ত অসি শাণিত করে। আমাদের জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।"

দশ

"বিসর্জ্জি, প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিল নীরবে।"

—মাইকেল।

একদিন একটা গৃহে আগুন ধরিয়াছে। তাহার মধ্যে অন্ধ গৃহস্বামী এবং বাত ব্যাধি-গ্রস্তা তাঁহার গৃহিণী। গৃহের অপরাপর লোকেরা পলাইয়া গিয়াছে। গৃহের তোরণে আগুন লাগিয়াছে। দ্বিতলের বারান্দা জ্বলিতেছে। সেইখানেও যুদ্ধ চলিতেছে। ইহার মধ্যে কে যেন বলিল—"এই গৃহে এক বৃদ্ধা ও এক অন্ধ পুড়িয়া মরিতেছে। রক্তবর্ণ অশ্বে আরূঢ়, বর্ম্মচর্ম্মে আবৃত দেহ এক তরুণ যুবক কাছেই যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি এই কথা শুনিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া অগ্নিময় তোরণ দিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলে নিষেধ করিল। কিন্তু সেই সকলের নিষেধের একটি বর্ণও তাঁহার কর্ণে পৌছিল না। যুবক ভিতরে ঢুকিয়া দেখেন, বৃদ্ধা ও অন্ধ দু'হাত তুলিয়া লাফাইতেছে এবং "আমরা গেলাম," "আমরা গেলাম" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। উত্তপ্ত গৃহের অগ্নি-নিশ্বাসে সেখানে ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিবার উপায় নাই, দেয়াল পুড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যুবক মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধা ও অন্ধের হাত ধরিয়া টানিয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া তাহাদিগকে তোরণের বাহির করিয়া

দিলেন। তাহাদের গায়ে আগুনের ফোস্কা, চুল ও ভ্রূ পুড়িয়া গিয়াছে; তীব্র ক্রন্দন করিতে করিতে তাহারা বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু সেই তরুণ যোদ্ধা তোরণ অতিক্রম করিবার মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ যেন উহা কাঁপিয়া উঠিল এবং সেই অর্দ্ধ দগ্ধ হর্ম্ম্য-চূড়া তাঁহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে এত বড় বিরাট স্তূপ যে, তন্মধ্যে তাঁহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

কিন্তু এই ব্যাপারটার কারুণ্য এখানেই শেষ হয় নাই। চারিদিক হইতে 'হায় হায়' শব্দ উত্থিত হইল। যেন সমস্ত সাভার রাজধানী 'হায় হায়' রবে হাহাকার করিয়া উঠিল। ধলেশ্বরীর উত্তাল তরঙ্গ যেন ক্ষণেকের জন্য থামিয়া গেল। "হায়! হায়!" কেহ বক্ষে করাঘাত করিতেছে, কেহ শোকে নিজ চর্ম্ম কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে, কেহ বা মাথার চুল উপড়াইয়া ফেলিতেছে। রোজ ত চোখের সামনে শত সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে,—কিন্তু আজ এ সার্ব্বজনীন আর্ত্তি কেন? "কি হইয়াছে, কাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে?" যে জানে না, সে জিজ্ঞাসা করিতেছে। কিন্তু কেহ উত্তর দিতেছে না, সকলেই বলিতেছে, "হায়! হায়!"

কতকগুলি লোক প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া সেই প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের রাশি রাশি উত্তপ্ত ইষ্টক সরাইয়া ফেলিল। কড়ি ও বরগা জ্বলিতেছে, লোহার শৃঙ্খলে তাঁহাদের একটা দিক বাঁধিয়া হাতী দিয়া সেগুলি টানিয়া ফেলান হইল। সেই তরুণ যোদ্ধাকে বাহির করা হইল। তিনি অনন্ত শয়নে শায়িত। উদর হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত সকলই পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, বক্ষ-পঞ্জর তোরণের

চাপে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই অমল ধবল, রক্ত অধর-পল্লবযুক্ত, সুন্দর কিশোর মুখখানি তেমনই আছে। আয়ত লোচন দু'টি মুদিত, যেন আর ক্লেশ নাই,—তাঁহার জীবনের সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে। তাঁহার দেবতুল্য মুখে স্বর্গের প্রসন্নতা। সেই সুকুমার দগ্ধ দেহ বাহির করার পর চতুর্দ্দিক ক্রন্দন ও শোকোচ্ছ্বাসে যেন ফাটিয়া পড়িল। এক বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, স্বর্ণভূষণা বর্ষিয়সী এক মহিলা ও একটি সুন্দরী তরুণী তথায় উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া তিন জনেই সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; শত্রুসৈন্যরাও সেই করুণ দৃশ্য দেখিয়া হাতিয়ার ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এ মৃত কে? ইনি যুবরাজ বিশ্বনাথ, সাভারের ভাবী রাজা, তাঁহার পার্শ্বে রাজা মহেন্দ্র সেন, রাজ-মহিষী ও যুবরাজ-পত্নী,—এই তিনজন মূর্চ্ছিত। এই শোচনীয় সংবাদ শত্রু-শিবিরে পৌঁছিল। সেনাপতি শৈবাল রায়, যুবরাজ ও শ্যামলকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সাভারের রাজকুমারের এই দশা দেখিয়া বাজাসনের যুবরাজের চক্ষে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন—"মহারাজ, এই অহিতকর, একান্ত অশুভ যুদ্ধ থামাইয়া দিন, আমি পিতা মহারাজকে দিয়া তাহাতে সম্মতি লওয়াইব।"

যুবরাজ পুনরায় বলিলেন,—"আজ হইতে একাদশ দিন যুদ্ধ স্থগিত থাকুক। ইহার মধ্যে যদি সাভারের সৈন্যরা যুদ্ধ করিতে চায়, কিংবা আমাদের উপর বাণ বা গুলি বর্ষণ করে, তবে তোমরা দাঁড়াইয়া মরিবে, কিন্তু হাতিয়ার গ্রহণ করিতে পারিবে না।"

কুমার যেন মৃত যুবরাজের সেই শতদল সুন্দর কোমল মুখ-মাধুরী কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না, কেবলই তাঁহার চক্ষু দু'টি অশ্রুপূর্ণ হইতে লাগিল।—"যুদ্ধ কি অশুভ, কি পৈশাচিক ব্যাপার, ইহা প্রত্যক্ষ না করিলে কিছুতেই আমি বুঝিতে পারিতাম না।"

সেইদিন কুমারের মনে যে বৈরাগ্যের উদয় হইল, তাহা শেষ পর্য্যন্ত সমানভাবে তাঁহার সমস্ত প্রকৃতি ও ব্যবহারকে সংযম-মণ্ডিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল।

সন্ধ্যাকালে একজন গুপ্তচর আসিয়া যুবরাজকে অতি সন্তর্পণে জানাইল—"যুবরাজ বিশ্বনাথ আগুনে পুড়িয়া মরেন নাই। যাঁহারা রাজবাড়ীর বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ অবগত আছেন, তাঁহাদের একজন জানাইয়াছেন যে, কুমার অনায়াসে তোরণ দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু দুষ্ট লোকেরা একধার হইতে লৌহ-দণ্ড দ্বারা পতনোদ্যত তোরণটা তাঁহার শরীরের উপর ফেলিয়া দিয়াছে।"

যুবরাজ—"কুমারের জন্য শোক ত দেখ্‌ছি সার্ব্বজনীন। এই লোকদের মধ্যে আমাদের দলের কি কেহ ছিল? যিনি নিজের প্রাণের আশা বিসর্জ্জন করিয়া আর্ত্তদিগকে ত্রাণ করিতে গিয়াছিলেন, সেই সদাশয়তার মূর্ত্তিমান দেবতাকে যদি আমাদের কেহ হত্যা করিয়া থাকে, তবে আমি তাহার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিব।"

গুপ্তচর—"যুবরাজ, আপনার এই সন্দেহ অমূলক। বাজাসনের কোন লোক এই গর্হিত কার্য্য করে নাই।"

যুবরাজ—"তবে কে? তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? জানিও, গুপ্তচর-প্রদত্ত প্রত্যেকটি সংবাদ গোপনীয় রাখাই রাজধর্ম্ম। আমি ইহা ঘুনাক্ষরেও কাহাকেও বলিব না।"

চর—"বলিতেও কষ্ট হয়, কার্য্যটি বড়ই নৃশংস ও অস্বাভাবিক। কৈবর্ত্ত মন্ত্রী বজ্রধ্বজ কুমারের শ্বশুর। তিনি তাঁহার লোক দিয়া সাভারের ভাবী রাজাকে হত্যা করিয়াছেন।"

যুবরাজ—"ইহাতে তাঁহার স্বার্থ কি?

চর—"যুবরাজ, কুমারের একটি পুত্র হইয়াছে; সে এখনও অপোগণ্ড শিশু, বয়স এক বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। এদিকে রাজা মহেন্দ্র সেনও অতি বৃদ্ধ। তিনি বেশীদিন বাঁচিবেন না। কুমার ছিলেন আশ্রিত-বৎসল, ন্যায়বান্ এবং অল্প বয়সেই লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ। তিনি প্রথম প্রথম শ্বশুরের অনুরাগী, ছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহার ভাবান্তর হইয়াছিল; তিনি মন্ত্রীর আবদার ও নানা অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিতেন, প্রজারা কৈবর্ত্ত মন্ত্রীর উপর হাড়ে হাড়ে চটা, কুমারের সহানুভূতি প্রজাদের প্রতি। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মন্ত্রী মহারাজা মহেন্দ্রের মৃত্যুর পর কুমারের যে তাঁহার প্রতি বিরূপতা থাকিবে, তাহার আভাষ বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন; শাসন-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে তিনি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। এদিকে কুমারকে সরাইয়া দিলে রাজার মৃত্যুর পর শিশু রাজার অভিভাবকস্বরূপ রাজ্য-শাসনের ভার দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার হস্তেই থাকিবে। তিনি কুমারকে হত্যা করিবার সুযোগ অনেক

দিন হইতেই খুঁজিতেছিলেন, এজন্য কয়েকজন দুষ্ট লোঁক সর্ব্বদা তাঁহার কাছে প্রস্তুত থাকিত।"

যুবরাজ—"আচ্ছা মন্ত্রীর কন্যা, যুবরাজ-মহিষী কি পিতার ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই?"

চর—"এতটা যে হইবে, তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু মন্ত্রী ইঙ্গিতে কুমারের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে যে সকল মন্ত্রণা দিতেন, তাহাতে তিনি সায় দেওয়া দূরে থাকুক, গত ছয় মাস পর্য্যন্ত কুমার সম্বন্ধে কোন মন্তব্যের প্রশ্রয় দিতেন না। শুনিয়াছি, জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের রাণী তাঁহার শিশু পুত্রসহ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার পর হইতে মন্ত্রীর অন্তঃপুরে গতিবিধিও অনেকটা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। কুমার তাঁহার শ্বশুরের যখন ইচ্ছা তখন রাজান্তঃপুরে যাতায়াত পছন্দ করেন নাই। রাজা শিশু পুত্রটিকে বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহার বিশ্বাস মহারাণীর উত্তেজনায় তিনি বিধবা রাণী স্বর্ণমঞ্জরীকে একটু কটু কথা বলিয়াছিলেন, তাহার ফলেই এ অনর্থ ঘটিয়াছিল।"

গুপ্তচর বলিল—"কুমারের সহ ছোট রাণী সহমৃতা হইয়াছেন। রাজা শোক সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি শিশু রাজকুমার ও রাজধানীর ভার মন্ত্রীর উপর দিয়া উত্তরে টাঙ্গাইলের ট্যাকে প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দিরের দিকে রওনা হইয়াছেন। ধলেশ্বরীর জলে যখন কুমারের শব ধৌত হয়, তখন যদি বৃদ্ধ রাজার কান্না দেখিতেন! তিনি সচিবদের হাত হইতে বারংবার নিজেকে

মুক্ত করিয়া নদীতে ডুবিয়া মরিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার কান্নায় পাষাণ গলিয়া গিয়াছিল!”

•

যুদ্ধ থামিল না। মহেন্দ্র সেন সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মহারাণী সহ তীর্থে গমন করার পর মন্ত্রী নূতন করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুয়াপুর রাজধানী হইতে প্রাপ্ত আদেশে সেনাপতি সর্দ্দার শৈবাল রায় সাভারের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়া বিষয়টার কোন আপোষ নিষ্পত্তি হয় কি না, তাহার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

শৈবাল রায় তাঁহার স্বগণ ও দেহরক্ষী উল্কা রায়ের সঙ্গে সাভারের মন্ত্রীর বাড়ীতে গেলেন; তাঁহার জন্য তাঁহাদিগকে কিছুকাল প্রতীক্ষা করিতে হইল, তিনি বাহিরে গিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটি অপরূপ সুন্দরী কুমারী বাহির হইয়া আসিলেন। সাভারের বৌদ্ধসমাজ একটু অগ্রসর। কুমারী আব্রু রক্ষা করেন নাই। তিনি নিঃসঙ্কোচে একখানি কারুকার্য্য-খচিত পাখা দাসীর হাতে দিয়া তাহাকে বলিলেন, অভ্যাগতদিগকে হাওয়া করিতে। কুমারীর আদেশে এক চামরধারিণী আসিয়া স্বর্ণদণ্ড একটি চামর দোলাইয়া তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। কুমারী এই দুই বিদেশী অতিথির মনস্তুষ্টির জন্য যেন অত্যধিক ব্যস্ত। যদিও বাহিরের গতিবিধির মধ্যে কুমারীর কোন লজ্জা বা দ্বিধার ভাব নাই, তথাপি তাঁহার বিনম্র মাধুরী শৈবাল সর্দ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মুখখানি লাবণ্যে চল

ঢল। কি চমৎকার দুটি পদ্ম-পলাশ চক্ষু! চোখের পাতাদু'টি কোমল ও মাটির দিকে নত। কিন্তু যখন তিনি তাহা মেলিয়া দৃষ্টি করেন, সে দৃষ্টিতে যেন মধু বর্ষিত হয়। একটা নীলমণির মালা গলায়, তন্নিম্নে সংলগ্ন একখানি পদ্মরাগ মণি। মস্‌লিনের সাড়ীর আঁচলে ঢাকাই কারিগর যেন স্বপ্নের জাল বুনিয়াছে! সেই আঁচলখানি কুমারীর স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া পৃষ্ঠে দোলায়মান বেণীর সঙ্গে দুলিতেছে। প্রতিটি সূক্ষ্ম-বিনানো বেণীর অগ্রভাগে এক একটা হীরার ঝাঁপা। মাথায় সিন্দুর বা অবগুণ্ঠন নাই। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"বাবা রাজবাড়ীতে নবকুমারের জন্য একটা সতর্ক ব্যবস্থা করিতে গিয়াছেন, তিনি এখনই আসিবেন। আপনাদের কোন দরকার থাকিলে দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন। তাঁহার জন্য আপনাদিগকে বেশী ক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইবে না।"

এই সময় অন্তঃপুরের আহ্বানে কুমারী কজ্জলিকাকে তখনই ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইল। সর্দ্দার বলিলেন—"কি চমৎকার মেয়েটি! যেন একখানি দেবীপ্রতিমা। আমি শ্যামলের জন্য একটি কণে খুঁজিতেছি। এইরূপ একটি মেয়ে যদি পাইতাম!"

উল্কা রায় বলিলেন—"আমি মন্ত্রীর কাছে কি প্রস্তাব করিব? আমি বলিতে পারি, আপনি চারিপাশের সাতটি পরগণার মধ্যে এরূপ আর একটি মেয়ে পাইবেন না।"

সেনাপতি,—"সাভারের মন্ত্রী এখন একরূপ এ দেশের রাজা; নবকুমার ইঁহার দৌহিত্র। সে বড় হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে

অনেক বৎসর লাগিবে। ততদিন তো মন্ত্রীই এই রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা। কজ্জল ইঁহার মেয়ে। আমাদের জাতির ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিতে কি তিনি রাজি হইবেন ?”

উল্কা রায়,—“শ্যামলের মত ছেলে ইনি সমস্ত দেশটা ঘুরিয়াও কোথায় পাইবেন ? রূপে গুণে সে সকলের সেরা। আমার মনে হয় কন্যাটি তাঁহারই যোগ্যা। এদিকে শুনিয়াছি, মন্ত্রী মোটেই জনপ্রিয় নহেন। আমাদের মহারাজা যদি যুদ্ধ বিগ্রহ এখন আরও চালান, তবে সাভারের স্বাধীনতা অটুট থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে এদেশের মন্ত্রীকে হয়ত আমাদেরই কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে। শুনিয়াছি, রাজা মহেন্দ্র সেন জাতি-ভেদের আঁটাআঁটি একেবারেই মানেন না। তাঁহারা নিজেরাই তো অনেকটা নামিয়া কৈবর্ত্তদের সঙ্গে কাজ করিতেছেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের অনেক সঙ্কটের অবস্থারই তো মন্ত্রী শ্যামলের বীরবিক্রম ও যুদ্ধবিদ্যার পরিচয় পাইয়াছেন। এ বিবাহে তাঁহার আপত্তি নাও হইতে পারে।”

সেনাপতি—“যাহা হোক্, মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া এ বিষয়ে প্রস্তাব আমরা করিতে পারি না।” চামরধারিণী ও ব্যাজনবাহিকার সম্মুখে এই আলোচনাটা সর্দ্দার পছন্দ করেন নাই। কিন্তু উল্কা রায় সরল প্রকৃতির লোক, সাংসারিক লোকের সাবধানতা তাঁহার মোটেই ছিল না। তাঁহার মুখ অপেক্ষা অসিই বেশী সতর্ক ছিল। সর্দ্দার ভাবিলেন, এই প্রসঙ্গটা এমনভাবে এখানে উত্থাপন করা সঙ্গত হয় নাই।

এই সময় মন্ত্রী উপস্থিত হইয়া ইঙ্গিতে সর্দ্দারকে ডাকিয়া তাঁহার দরবার গৃহে লইয়া গেলেন। উল্কা রায়কে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সর্দ্দার দরবার-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একখানি রৌপ্যমণ্ডিত সুন্দর সিংহাসন গৃহের মধ্যভাগে; তাহা হইতে কতকটা দূরে, নীচে একখানি সাধারণ আসন। মন্ত্রী রৌপ্য সিংহাসনে বসিয়া সর্দ্দারকে নিম্নাসনে বসিতে বলিলেন। বয়সের আধিক্য নিবন্ধন সর্দ্দারের রক্ত কতকটা শীতল হইয়া গিয়াছিল। তিনি এই অপমান সহিয়া লইলেন।

কতকটা উষ্ণ স্বরে মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"সর্দ্দার, আপনার আমার কাছে কি দরকার?"

হয়ত মন্ত্রী তখন ভাবিতেছিলেন, সাভারের ভাবী রাজার মাতামহের সম্মান রাজারই মত এবং চণ্ডাল সর্দ্দার তাঁহার ভৃত্য-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

সেনাপতি বুঝাইয়া বলিলেন—"বাজাসন-রাজ আপনাদের উপর্য্যুপরি বিপদে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। আশা করি, যাহাতে যুদ্ধ এখানেই থামিয়া যায়, আপনারা তাহার ব্যবস্থা করিবেন।"

অতিশয় ক্রুদ্ধ স্বরে মন্ত্রী বলিলেন—"যুদ্ধ হইলে জয়-পরাজয় এবং মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আমাদের রাজা ও রাজমন্ত্রী এখনও জীবিত। অসংখ্য কিরাত-সৈন্য এখনও আমাদের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যুবরাজ নিহত হইয়াছেন; লোকে বলে অন্যায় করিয়া অর্দ্ধদগ্ধ তোরণটা আপনাদের লোকেরাই ঠেলিয়া ফেলিয়া

তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে। যাহা হোক্, যুবরাজ মৃত হইলেও যুবরাজের পুত্র বর্ত্তমান। আপনাদের রাজার আমাদের দুঃখে বিগলিত হইবার এখনও সময় হয় নাই। এ অবস্থায় সন্ধির প্রস্তাব অসাময়িক হইয়াছে। যদি বাজাসন-রাজা তাঁহার নিজ বলের ন্যূনতা লক্ষ্য করিয়া সন্ধির জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, তবেও একজন অস্পৃশ্য নিম্নতম বরকন্দাজ শ্রেণীর লোকের মুখে এইরূপ প্রস্তাব প্রেরণ করা শোভনীয় হয় নাই। যাহা হোক্, আমি উঠিলাম, আপনার সঙ্গে এইরূপ রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় আমার পদোচিত মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয়।" এই বলিয়া পশ্চাৎ দিকের দরজা খোলাইয়া সর্দ্দারকে তিনি রাস্তার পথ দেখাইয়া দিয়া নিজে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন।

এদিকে সর্দ্দারের সর্ব্বশরীর অপমানে জ্বলিয়া যাইতেছিল। তিনি উল্কা রায়ের কথা ভুলিয়া গিয়া দ্রুতপদে স্বীয় শিবিরের দিকে চলিতে লাগিলেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রী শুনিলেন, কুমারী কজ্জলার সহিত সর্দ্দারের স্বীয় পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করা তাঁহার মনস্থ ছিল। এই কথা লইয়া হাস্য পরিহাস চলিতেছিল। কথাটা শুনিয়া রাগে মন্ত্রীর শরীর যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি খোঁজ করিয়া জানিলেন, সর্দ্দারের সহচর উল্কা রায় সর্দ্দারের প্রতীক্ষায় এখনও বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করিতেছেন। তখন মন্ত্রী উন্মত্তের মত যাইয়া বলিলেন—"চাঁড়াল, তোমাদের এত আস্পর্দ্ধা! আমার মেয়ের সঙ্গে সেই লেঠেলের সর্দ্দার চণ্ডাল-তনয়ের বিবাহ-

প্রস্তাব করিতে মনস্থ করিয়াছে! তোমাদের দুঃসাহস ধন্য! ব্রহ্মক্ষত্রিয়দের সঙ্গে দুই পুরুষ যাবৎ বৈবাহিক সম্বন্ধের দরুণ আমাদের এদেশে পদ-মর্য্যাদা কত বড় তাহা জান? যাহা হোক্, রুদ্রতেজ, তুমি এই অপদার্থ চাঁড়ালটার কান ধরিয়া এখান হইতে উঠাইয়া দাও। সেই হতভাগ্য সর্দ্দারটা বোধ হয় ইহার মধ্যে শিবিরে চলিয়া গিয়াছে। সরিৎপতি, তুমি ইহার ঘাড় ধর, এবং রুদ্রতেজ ইহার কাণ মলুক। সেই সর্দ্দারটার কোন শাস্তি দিতে পারিলাম না,—ইহাই বড় দুঃখ রহিল। কিন্তু ইহার উপর দিয়া যে শাস্তি হইবে, তাহাতেই তাহার শিক্ষা হইবে।" প্রভুর আদেশে সেই সৈন্য দুইটি লেলিহান্ কুকুরের মত উল্কা রায়কে অপমান করিতে গেল। অকস্মাৎ উন্মুক্ত অসি উদ্যত করিয়া উল্কা রায় তীরের মত দ্রুত গতিতে সেনাপতির দিকে অগ্রসর হইল এবং সেই অসির প্রবল এক আঘাতেই তাঁহার শিরোশ্ছেদ করিয়া ফেলিল। অন্তঃপুরে হাহাকার পড়িয়া গেল। গৃহের অপরাপর সৈন্যরা উল্কা রায়কে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহার অসি কাড়িয়া লইল।

এই আকস্মিক, ভীষণ সংবাদে সাভার রাজধানী স্তম্ভিত হইয়া গেল। জনসাধারণ কিন্তু এই ঘটনায় ভগবানের হাত দেখিতে পাইল। এই দুর্ব্বীনিত ও দুশ্চরিত্র কৈবর্ত্ত মন্ত্রীর ব্যবহারে সকলেই অতিশয় অসন্তুষ্ট ছিল। সুতরাং স্পর্দ্ধা ও পাপ চরম সীমায় উঠিয়াছিল, ধর্ম্ম তাহা সহিতে পারেন নাই।

শান্তাচার্য্য একজন ব্রাহ্মণকে সচিবের পদে নিয়োগ করিলেন;

উল্কা রায়ের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। অতি সুরক্ষিত অবস্থায় নবকুমারকে প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দিরে রাজা ও মহিষীর নিকট প্রেরণ করিয়া সাভারের রাজধানী তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় রহিল।

এদিকে দুর্জ্জয় সেন সমস্ত সংবাদ পাইয়া প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দিরে দূত পাঠাইয়া সাভারাধিপকে জানাইলেন, তিনি ধামরাই সঙ্ঘারামের দাবী ছাড়িয়া দিলেন, আর যেন যুদ্ধ না হয়। পুত্রশোকাতুর সাভারের রাজা এই পত্র পাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বাজাসনে যে চিঠি পাঠাইলেন, তাহাতে অপরাপর কথার মধ্যে লিখিত ছিল—"যুদ্ধবিজয়ী হইয়াও আপনি যে সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ ; আর আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধের শক্তি বা সাধ্য নাই। মন্ত্রীর দৌরাত্ম্যে দলে দলে কিরাত-সৈন্য আপনাদের অনুকূল হইয়াছিল,—যুদ্ধ চালাইলে তাহারা হয়ত আপনাদের দলেই ভিড়িয়া যাইত। সুতরাং যুদ্ধ ক্ষান্ত করিয়া আপনারা আমার সম্মান রাখিয়াছেন। এখন ধামরাইয়ের সঙ্ঘারাম আপনারা লইয়া গেলেও আপত্তি করিবার কোনই কারণ নাই। আমি মহারাজের জ্ঞাতি, কিন্তু জাতিভ্রষ্ট। তথাপি সম্পর্কে আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, আমি আপনাকে প্রণাম জানাইতেছি।"

এদিকে কজ্জলিকাকে লইয়া কি করা যাইবে, নিহত মন্ত্রীর পরিবারে ইহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল,—"বাজাসনের লোকেরা ইহাকে অন্যায়ভাবে দাবী করিতে

কখনই ছাড়িবে না।" সেই শোক-সন্তপ্ত পরিবারের আশঙ্কার হ্রাস হইল না। বহুলোক বলিল,—"আমাদের মন্ত্রী যেরূপ ভাবে সর্দ্দারকে অপমান করিয়াছিলেন এবং উল্কা রায়কে একটা কুকুরের মত কাণ ধরিয়া গৃহের বাহির করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, তৎপর শূলে চড়াইয়া তাহার প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে,—এই অপমান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ অবশ্যই সর্দ্দার লইবেন। যদিও যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি কজ্জলকে পুত্র-বধূস্বরূপ স্বগৃহে লইতে নিশ্চয়ই চেষ্টিত হইবেন। তাহা হইলে তাহার পিতৃহন্তা চণ্ডালদের গৃহে যাওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই।

কজ্জল ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল—"আমি কিছুতেই চণ্ডালের গৃহে যাইয়া চণ্ডাল শ্রেণীভুক্ত হইব না। আমার জন্যই আমার পিতার চণ্ডালের হস্তে মৃত্যু!"

শাস্তাচার্য্যকে কজ্জল বলিল—"রাজা অতি বৃদ্ধ, হয়ত বেশী দিন বাঁচবেন না। যে কোন প্রকারে হোক দুর্দ্দান্ত চণ্ডাল-দস্যুরা আমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবে। প্রভু! এই বিষম সঙ্কটকালে আমাকে উদ্ধার করুন।" শাস্তাচার্য্য সেইরূপ একটা সুব্যবস্থা করিলেন, তাহা পরে লিখিত হইবে।

এগার

আজি কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌর বরণ করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥
—চণ্ডীদাস।

যুবরাজ ও শ্যামলকে লইয়া সেনাপতি শৈবাল রায় সুয়াপুরে ফিরিয়াছেন। আসা মাত্র সর্দ্দার সংবাদ পাইলেন, তাঁহাদের জাতির গুরু 'সব-দেওয়া-বাবা' তাঁহার ঠিকানা দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, হংসরাজ তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে যে ছেলেটিকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে যেন কিছুকালের জন্য তাঁহার আশ্রমে রাখা হয়।

রাজার কাছে সর্দ্দার অনুমতি চাহিলে যুবরাজ ধরিয়া বসিলেন, তিনিও তাঁহার গুরুভাইয়ের অনুগামী হইবেন এবং সন্ন্যাসীর আশ্রমে ঐ সময়টা কাটাইয়া আসিবেন। যথাসম্ভব ছদ্মবেশে যুবরাজ যাইবেন, তাঁহার পরিচয় সহজে কাহাকেও জানান হইবে না। রাজা ও রাজমহিষী ভাবিলেন, দীর্ঘকাল যুদ্ধক্লান্ত এই তরুণদ্বয় একটু শান্তিতে থাকিতে চাহেন, ক্ষতি কি?

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। গুরুদেব ছিলেন হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামের বিষ্ণুমন্দিরে।

সেখানে যাইয়া তাঁহারা দেখিলেন, মঠস্বামী স্থবিরানন্দ অতি প্রাচীন। কিন্তু নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তিনি অতি অল্প কথা বলেন, অপর সন্ন্যাসীরা অতি সশ্রদ্ধভাবে তাহা শোনেন। তাঁহার আহার অতি সামান্য, একভাবে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকেন; কখন কখনও পদ্মপত্রের উপর যেরূপ নববর্ষার জল টল্‌টল্ করে, তাঁহার সেইরূপ আয়ত, সুদীর্ঘ চোখের পাতার প্রান্ত হইতে মুক্তাবিন্দুর মত বারি বর্ষিত হয়। মুখখানি আনন্দময়। এত যে বয়স হইয়াছে তথাপি মুখ দেখিলে মনে হয়, ইঁহার অন্তঃকরণ বালকের ন্যায় প্রফুল্ল ও সরল। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে শ্যামল ও যুবরাজ যাইয়া সেই সাধুর পার্শ্বে বসিল। তিনি শ্যামলকে বলিলেন,—"আমিই তোমাদের দেশে 'সব-দেওয়া-বাবা- নামে পরিচিত। আমার জাতি নাই, পরিবার নাই, গোত্র নাই, উপাধি নাই। আমি যেখানে থাকি, সেইখানেই আমার যাহা কিছু বিলাইয়া দেই। সেই যাহা কিছু আর কিছুই নহে, আমার কতকগুলি কথা। আমি কথার ঝুড়ি। সেই কথার ঝুড়ি হইতে কয়েকটি কথা তোমাদিগকে দিব বলিয়াই শ্যামলকে চাহিয়া আনিয়াছি।"

পার্শ্বস্থ সন্ন্যাসীরা পূরক, কুম্ভক, রেচক, অনিমা, লঘিমা, পয়ঃস্তম্ভিনী, অগ্নিস্তম্ভিনী, ব্যোম-সঞ্চারিণী প্রভৃতি হঠযোগের দ্বারা অর্জ্জিত বহু শক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। "সব দেওয়া-বাবা' চুপ করিয়া শুনিলেন, কোন কথা বলিলেন না। ইহার মধ্যে একটি সন্ন্যাসীর গাঁজার কল্কে হইতে একখণ্ড জলন্ত

অঙ্গার তাঁহার বাহুতে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসীরা তর্কে প্রমত্ত, তাহা লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, খানিকটা ত্বক্ ও মাংস পুড়িয়া 'সব-দেওয়া-বাবার' হাতে মস্ত বড় একটা ফোস্কা পড়িয়া আগুন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তিনি ধ্যানের ভাবে ছিলেন, চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িয়া গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতেছিল। তিনি নিজের ভাবেই বিভোর, আগুনের সেই বড় ফোস্কার উপর দৃকৃপাতও করেন নাই। শ্যামল চীৎকার করিয়া বলিল,—"সব-দেওয়া-বাবা' আপনার হাতটা যে পুড়িয়া গেল!" হাসিতে মুখখানি মণ্ডিত করিয়া তিনি বলিলেন—"উহাতে **আমার** কিছুই দগ্ধ হয় নি।"

পার্শ্ববর্ত্তী এক সন্ন্যাসী বলিলেন—"যুবক, জান না ইনি "নেতি-সাধনায়" সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ?

"নেতি সাধনা" কি ? শ্যামল বুঝিলেন, ইহা আমার নহে, উহা আমার নহে, এই জ্ঞানের পূর্ণ উপলব্ধিই 'নেতি-সাধনা'। এই সাধনা পূর্ণ হইলে আত্মা বিদেহী হইয়া যায়।

শ্যামল—'সব-দেওয়া-বাবা'র প্রতি সশ্রদ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন—"বাবা, এই সকল হঠযোগের শক্তির কথা, যাহা ইহারা বলিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আপনার মত আমরা জানিতে চাই।"

সব-দেওয়া-বাবা,—"মানুষ সকল জীবজন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য জীব যাহা পারে, তপোবলে মানুষ তাহা পারিবে না কেন ? বিড়াল আঁধারে দেখে, শ্যেনপাখী বহু ঊর্দ্ধ হইতে শিকারের প্রাণী দেখে, গভীর জলে মাছের নিশ্বাস রুদ্ধ হয় না, সে তথায় সকলই

দেখিতে পায়, আকাশে পাখীরা কত উচ্চে উড়িয়া যায়,—মানুষ চেষ্টা করিলে এই সমস্ত শক্তিই আয়ত্ত করিতে পারে। কিন্তু ততঃ কিম্? ক্ষমতা-বলে লোকের প্রতিষ্ঠা হয়। যাহার ক্ষমতা আছে, তাহার কাছে জগৎ অবনত। সেই ক্ষমতা কে না চায়? দেখ, আমি ক্ষমতা চাই না। ঐ সকল জীব-জন্তুর সে সকল ক্ষমতা আছে তাহাতে কি উহারা আমাদের প্রণম্য হইয়াছে? বলি, মান্ধাতা, জরাসন্ধের ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা কি লোকের নিকট পূজা পান? কয়েকজন ফকির, সাধু, সন্ন্যাসীর জন্য কত মঠ-মন্দির উঠিয়াছে। লোকের নিত্যপূজা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে যাইতেছে। সুতরাং লোকে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষমতাকে ভয় করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে পূজা করে না।"

এই কথা হইতেছিল, এমন সময় একটি তরুণ বালক সেখানে আসিয়া বসিল। বালকের মাথায় চুলের গুচ্ছ, একরাশ কৃষ্ণবর্ণ ফুল যেন কে তাহার মাথায় ছড়াইয়া দিয়াছে! আঁটা-সাঁটা পোষাকে দেহ আবৃত, শুধু মুখখানি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিয়দংশ দেখা যায়। তাহাতে মনে হইল, লক্ষ ছেলের মধ্যে ইহাকে বাছিয়া লওয়া যায়। এ ছেলে যেন সুকোমল একটি পুষ্প, সুরভিই যেন ইহার সম্পত্তি, নৈসর্গিক কোমলতাই যেন ইহাকে নিজ হস্তে লাবণ্যের ফুলহার পরাইয়া দিয়াছে। দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি কি সুন্দর, কি করুণ, কি নম্র! যেন কুবলয়ের কুঁড়ি ফুটিতেছে, শিশির বিন্দু ও উষার আলো তাহার অনাগত সৌন্দর্য্যের আগমনী বুঝাইতেছে। বালকটিকে দেখিয়া শ্যামলের চক্ষু দুইটি স্থির

হইয়া গেল। শ্যামল তাহার দিকে একটু ঘেঁষিয়া বসিতে যাইয়া দেখে, সে অত্যন্ত সমীহ করিয়া সরিয়া বসিল।

ভ্রমর যেরূপ সৌরভে মাতোয়ারা হইয়া অস্ফুট কুঁড়ির চৌদিকে আনাগোনা করে, শ্যামল বালকটির রূপে তেমনই আকৃষ্ট হইল।

কিন্তু একটু সরিয়া বসিলেও বালকের কথাবার্ত্তায় কোন সঙ্কোচ নাই।

শ্যামল—"এখানে তোমার অভিভাবক কে?

বালক—"স্বামী স্থবিরানন্দ। আমি বালক, এখানে যাঁহারা আছেন সকলেই, ধরুন, আপনিও আমার অভিভাবক।" বালকের কণ্ঠস্বর অতি মধুর, যেন বীণা বাজিয়া উঠিল।

একদিনের মধ্যেই এই অপরিচিত বালকের সঙ্গে শ্যামলের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া গেল। তাঁহারা দুইজনে প্রায়ই একস্থানে থাকেন, মাথা-মুণ্ডু কত কিছু যে বলেন, তাহার ঠিকানা নাই। এই অর্থ-শূন্য কাকলীতে দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইয়া যায়।

একদিন যুবরাজ ও শ্যামল ঘোড়ায় চড়িয়া বনে বেড়াইতে-ছিলেন; শিকারীরা কতকগুলি ময়ূর মারিয়াছে। প্রকাণ্ড এক ঝুড়িভরা ময়ূর পুচ্ছ একটা কৃষ্ণবর্ণ বাহক লইয়া যাইতেছে। মনে হয় যেন মেঘের কাঁধে চড়িয়া ইন্দ্রধনু চলিয়াছে!

এমন সময় হঠাৎ একটা বীভৎস বিকট ধ্বনিতে যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন। সম্মুখের পা দু'টি উর্দ্ধে তুলিয়া ঘোড়াটা যেন

আকাশে মুখ ছুঁড়িতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই যুবরাজ বুঝিলেন, গিরি-গুহার মত হা করিয়া, বিকট দন্ত বিকাশপূর্ব্বক চক্ষু-তারকায় তীক্ষ্ণ দীপ-শিখা জ্বালাইয়া নরখাদক একটা ব্যাঘ্র তাঁহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিতেছিল, কিন্তু কামড়াইবার মুহূর্ত্তে সে বায়ুপথ হইতে মাটিতে পড়িতে গিয়া তাহার শানিত নখরে ঘোড়াটির দেহ ক্ষত করিয়াছে। বাঘ তাঁহাকে কামড়াইল না কেন, মাটিতে পড়িয়া গেল কেন?

যুবরাজের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দেখিতে পাইল যে, একটি বাণ বাঘের মুখের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া সেই করাল দংষ্ট্রা বদনের ব্যাদান বন্ধ করিয়া দিয়াছে, দ্বিতীয় বাণটি তাহার উদরের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়াছে।

যুবরাজ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া ঘোড়ার দেহে ব্যাঘ্রের নখরের ক্ষত স্বীয় উষ্ণীষের বস্ত্র দিয়া বন্ধ করিলেন। কোথা হইতে শ্যামল আসিয়া নিকটবর্ত্তী প্রস্রবণ হইতে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া বনজ লতা-পাতার প্রলেপে ক্ষত-মুখ ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। বাঘটার প্রাণ-বায়ু ক্রমশঃই চলিয়া যাইতেছিল। পশ্চাদ্‌বর্ত্তী শিকারীর দল আসিয়া বাঘটাকে লইয়া যাইতে যাইতে বলিল—"আমাদের তাড়া খাইয়া বাঘটা চীৎকার পূর্ব্বক লাফাইয়া পড়িয়া এই তরুণ অশ্বারোহীকে প্রায় হত্যা করিয়াছিল আর কি? কিন্তু ধন্য সেই তীরন্দাজের শিক্ষা, শক্তি ও ক্ষিপ্রতা! সে ঠিক মুহূর্ত্তে বাঘটার মুখটাকে এমনভাবে সেলাই করিয়া বন্ধ করিতে পারিয়াছে!

ঘোড়াটা একটু খোঁড়াইতেছিল এবং ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। যুবরাজ বল্গা ধরিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলও স্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে লইয়া হাঁটিয়া চলিতে লাগিল।

যুবরাজ বলিলেন—"গুরুভাই, যুদ্ধকালে তুমি বহুবার আমাকে রক্ষা করিয়াছ, আজও এই ঘোর জঙ্গলে তোমারই কৃপায় আমি প্রাণ পাইলাম। কিন্তু বাঘটাকে আমি অবশ্য দেখিতে পাই নাই, কারণ ভগবান্ আমার ঘাড়ের পাছে আর একটি চোখ দেন নাই। কিন্তু তুমি কি করিয়া বাঘটাকে দেখিলে? আমি তো পিছন ফিরিয়া তোমাকে দেখি নাই, বাঘটার মুখ বন্ধ হওয়ার খানিক পরে দেখিলাম, তুমি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া ছুটিয়া আসিতেছে।"

শ্যামল—"যুবরাজ, একটি বিদ্যা আমি এখনও তোমাকে শিখাই নাই। এই যুগে এই বিদ্যা বড় কেহ জানে না। পাহাড়িয়া নাগাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহা এখনও জানে। এই বিদ্যা শব্দ-ভেদী বাণ-চালনা। রামায়ণে হস্তীর নর্দ্দন মনে করিয়া এই বিদ্যার বলে দশরথ ঋষিকুমারকে হত্যা করিয়াছিলেন। এখনও পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের কোন কোন যোদ্ধা এই বিদ্যায় কৃতী। তৈমুর লঙ্গের পুত্র মিরূচাকে অন্ধরাজ শব্দভেদী বাণদ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন। বাঘের ডাক শুনিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম, সে কোন শিকার পাইয়াছে। শিকারীরা তাহাকে তাড়া করিয়াছিল, এ সময় এরূপ গর্জ্জন করা বাঘের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। তুমি

অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিতেছ, সুতরাং বিপদের আভাষ পাইয়া আমি শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণ ছুঁড়িলাম।

বলা বাহুল্য আর এক সপ্তাহের মধ্যে যুবরাজ শব্দভেদী বাণ-প্রয়োগে দক্ষতা লাভ করিলেন।

এইভাবে যুবরাজ সেই জঙ্গলপূর্ণ প্রদেশে প্রাতে পশুপক্ষী শিকার করিতেন। শ্যামল সেই অপরিচিত বালকের স্বর্গীয় সঙ্গে সেই সময় নির্জ্জনে কাল কাটাইতেন। কখনও তিনি দেখিতেন, নদীর কূলে গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ শোভিত মাথাটি হেলাইয়া বালক পাথরের উপর বসিয়া আছেন। নীলবর্ণের স্বর্গ-সুষমা যেন তাহার চোখে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, কখন কখনও আয়ত-লোচন বালক কাঁদিতেছেন,—মুক্তার মত, নির্ম্মল বর্ষার বৃষ্টি-বিন্দুর মত অজস্র অশ্রু পড়িয়া পড়িয়া পাথরখানির একটি স্থান আর্দ্র করিতেছে, তাম্বুলরঞ্জিত অধরের একপ্রান্ত ঈষৎ কুঞ্চিত। যেন করুণার জীবিত প্রতিমূর্ত্তি। "বালক, তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এমন কি দুঃখ। তুমি কেন এত সুন্দর, তুমি কেন এত দুঃখী? তোমাকে যে বিধাতা গড়িয়াছিলেন, তিনি হয়ত টগর ও রজনীগন্ধা নির্ম্মাণ করিয়াই গড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাই সেই সুবাসিত পুষ্প-গন্ধ তোমার দেহে যেন লাগিয়া আছে! তোমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ও সেই গন্ধ! কত বেলফুল, কত মল্লিকার সুবাস তোমার নিশ্বাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে! বিধাতা তাঁহার এত সাধের সৃষ্টির উপর কেন এত নির্দ্দয়? কেন তিনি তোমাকে কাঁদাইতে ভালবাসেন?"

শ্যামলের মনে এমন ধারা কত প্রশ্ন! তিনি বালককে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা বোধ করেন। যদি বা কোনদিন আভাষে জিজ্ঞাসা করেন,—"তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে? তোমার কি মাতাপিতা আছেন? তোমার কি কোন দুঃখ আছে? বল,—আমি যে তোমার এই ভাব দেখিলে মনে বড় কষ্ট পাই!"

বস্ত্রান্তে চোখ মুছিয়া সেই বন-দেবতার মত সুন্দর বালক বলে,—"আপনি কি জানেন না, এই আশ্রমের নিয়মানুসারে কাহারও পরিবারের বা পূর্ব্ব কথা জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ?"

রূঢ় ভাষায় নহে, অতি নম্র স্বরে, বিনয়মাখা কণ্ঠে যখন বালক এই কথাগুলি বলে তখন শ্যামল আঘাত পান না, একটু লজ্জিত হন মাত্র। আঘাত দেওয়ার কথা বালক জানে না। কোন রূঢ় প্রসঙ্গ তুলিলেও সে এত সহজ বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে যে, সে কথায় রূঢ়তার লেশমাত্র থাকে না।

তবু বালক একটি রহস্য। ফুল যেরূপ তাহার শত শত মনের কথা লইয়া শুকাইয়া মরিয়া যায়, তবু তাহা মুখ ফুটিয়া বলে না, একি সেইরূপ মৃত্যুপণ নিস্তব্ধতা? শ্যামলের মনে শত দুঃখ গুমরিয়া উঠে। আবার বালকের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বর্ষণোন্মুখ হয়, সে অতি কষ্টে উদ্যত অশ্রু সংবরণ করিয়া ধীরপদ-ক্ষেপে চলিয়া যায়।

কখনও কখনও শ্যামল ও বালককে খুব খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেও দেখা যায়। আশ্রমের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া বালক উড্ডীন বক-পংক্তি সূর্য্যের অস্ত-রাগে রঞ্জিত হইতে দেখে,

কিংবা নদীজল-সংপৃক্ত, আর্দ্র, সাবলীল পুষ্প-সুরভিত সমীর উপভোগ করিতে করিতে বলে—"আজ আপনার সঙ্গ বড়ই ভাল লাগিতেছে। আমার মনে হয়, দিনের পর দিন না খাইয়া-দাইয়া আপনার সঙ্গে আমি এই ভাবে কাটাইয়া দিতে পারি।"

যুবরাজ হঠাৎ একটা ঝড়ের মত সেখানে আসিয়া বলিল,—"তুমি যে আমার গুরু-ভাইকে দখল করিয়া বসিয়াছ, এতটা সহিব কেন? আমি উঁহার পুরাতন ভাগীদার, তাহা কি তুমি জান না?"—বালককে এই কথা বলিয়া শ্যামলকে বলিলেন—"তারপর ভাই, তুমি যখন বিবাহ করিয়া বউএর চাঁদপানা মুখ দেখিয়া গুরুভাইকে ভুলিবে, তখন তাহার উপায় কি হইবে? আমি এখন ইঁহার সঙ্গে মিতালি করিয়া সেই দুর্দ্দিনের কিছু সম্বল করিয়া রাখি।"

বালক বলিল—"ধ্যেৎ, কথার অত কায়দা আমি জানি না।"

যুবরাজ বালকের দিকে চাহিয়া বলিল "কিন্তু ইনি আমার গুরুভাই, আমার বাবা মা ইঁহারই হাতে আমাকে সঁপিয়া দিয়াছেন, আমি তোমাকে ইঁহার একচেটিয়া অধিকার দিব না।"

বালক বলিল—"কে আপনার কাছে সে অধিকার চাহিতেছে? আপনি ভাগীদার আছেন, ভাগীদারই থাকুন। আসুন, বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যাটা এখানে কাটান যাক্। কেমন ঝুর ঝুর করিয়া বায়ু বহিতেছে, আজ আর বৃষ্টি হইবে না। আপনি আজ সকালে শিকার করিয়া কি পাইলেন, বলুন। আপনি রোজ আমায় ময়ূরের পাখাগুলি দেবেন, আমি আপনাদের দু'জনের জন্য টুপি ও পাখা তৈয়ারী করিয়া দিব। বন হইতে কিছু শোলাও আনিবেন

ও নগর হইতে কিছু রং ও অভ্র আমাকে আনিয়া দিবেন।” এই বলিয়া বালক সেখানে বসিয়া পড়িলেন এবং যুবরাজ তাঁহার সেদিনকার শিকার কাহিনী বলিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে দুইটি টুপি ও দুইটি পাখা লইয়া বালক যুবরাজ ও শ্যামলকে খুঁজিয়া বাহির করিল। তাঁহারা বালকের কৃতিত্ব দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। একখণ্ড দীর্ঘ অভ্রকে রং দ্বারা কয়েক ভাগে বিভাগ করিয়া, কোন ভাগে বুদ্ধের জন্ম, কোন ভাগে ছন্দককে ঘোটক-সহ রাজ পরিচ্ছদ-দান, কোন ভাগে কুমার রাহুলের দীক্ষা, কোনভাগে বুদ্ধ ও আনন্দের ধ্যানস্থ মূর্ত্তি অতি সূক্ষ্ম তুলিতে আঁকিয়াছেন। কোন ভাগে অশোকের কলিঙ্গ-যুদ্ধ,—এণ্টিগোনাস্, মগাস, টলেসি প্রভৃতি বিদেশী রাজাদের নিকট দূত ও ভিষকপ্রেরণ, কোনটিতে দুর্ভিক্ষ-নিবারণার্থ চন্দ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্য-যাত্রা, কোন স্থানে সিংহপুরের দৃশ্যাবলী ও বিজয়ের সিংহল-যুদ্ধ,—কত ঘটনা, কত দৃশ্যই বালক নানা ভাবে ও বর্ণে আঁকিয়াছে! শিল্পী হিসাবে এ তো বালক নহে, এ যে শিল্পাচার্য্য। ইহার ইতিহাসের জ্ঞান ও চিত্রণ কি অদ্ভুত! চিত্রগুলি অতি ক্ষুদ্র, তথাপি তাহার সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন এত সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন ও নির্দ্দোষ যে, কোন স্থানে রেখা অযথা বাঁকে নাই অথবা কোনদিকে হেলিয়া যায় নাই। আতস-কাঁচ দিয়া দেখিলে ছবিগুলির প্রতি সুবিচার করা হয়।

সবিস্ময়ে শ্যামল বলিল—“এ কি তুমি আঁকিয়াছ?”

—“হাঁ আমি।”

—"তুমি!"

—"হাঁ আমি, আমি—আমি। এখানে আবার কোথা হইতে পটুয়া ধরিয়া আনিব?"

—"তুমি আর কি কি ছবি আঁকিতে পার?"

—"ছাই-পাঁশ, আবর্জ্জনা, কত কি?"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাঁহারা উভয়ে এই গুণী বালকের গুণের পরিচয় পাইলেন। এ বালক সামান্য নহে।

কখনও কখনও শ্যামল বালককে লইয়া মন্দির সংলগ্ন ধানের ক্ষেতের আইলের পথ ধরিয়া চলিতে থাকিত। তাহারা দেখিত, নীলবর্ণের ছোট ছোট পাখী টকটকে লাল রঙের লঙ্কাগুলি ঠোকরাইতেছে এবং সান্ধ্যসমীরে সারিবদ্ধ তমাল গাছগুলির পাতা ঘন ঘন নড়িতেছে,—মনে হইতেছে যেন সমস্ত তমালবন কোন প্রবাসে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সেই সময় শ্যামল অতি স্নিগ্ধ চক্ষে বালকের মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার বিম্বাধরের মধুর হাসিটা দেখিয়া শ্যামলের তৃপ্তি হইতেছে না। কিন্তু যখনই সে বালকের কোমল হাত দু'খানি নিজের দৃঢ়হস্তে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই বালক কতক হাসির সহিত বিরক্তি মিশাইয়া নিজের হাত সরাইয়া লইতেছে। এ বিষয়ে বালক এত সতর্ক যে, তাহার ধুতির কোঁচা যদি দুলিতে দুলিতে শ্যামলের গায়ে ঠেকিত, তবে যেন সে শঙ্কিত হইয়া একটু দূরে যাইত। 'সব-দেওয়া বাবা' অর্থাৎ স্থবিরানন্দ এ সকল বিষয়ে কিছুই বলিতেন না। তিনটি ছেলে যাহা ইচ্ছা করিত,

বনে জঙ্গলে ঘুরিত, যখন ইচ্ছা তখন বাড়ীতে ফিরিত। সেই তরুণ বালকের সহচর একটি বালক ছিল; সে তাহার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। বালকটির সঙ্গে সে একখানি মাদুর পাতিয়া একটা নির্জ্জন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শুইয়া ঘুমাইত। তাহার নাম ছিল কিশোরক। সে সর্ব্বদাই যেন বিমর্ষ থাকিত। এমন কি বালক যখন অপর দুই সঙ্গীর সঙ্গে মিশিয়া হাসিয়া খেলাইয়া বেড়াইত এবং প্রফুল্লতা দেখাইত, তখন সে নিজ প্রকোষ্ঠে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত এবং তাহার দুইটি চোখ হইতে অজস্র অশ্রু পড়িতে থাকিত।

শ্যামল ও যুবরাজের কাছে এই দুই বালকেরই ব্যবহার রহস্যময় ঠেকিত। এরা কে? কেন এখানে আসিয়াছে? এত অল্প বয়সে যেন তাহাদের জীবন প্রহেলিকাচ্ছন্ন। ইহাদের বিষন্নতার কারণ কি?

একদিন যুবরাজ শ্যামলকে বলিল,—"আচ্ছা গুরুভাই, তুমি তো আমাকে খুব ভালবাস, তুমি তো আমাকে চোখে হারাও। এই চার পাঁচ বছর বিপদে, যুদ্ধক্ষেত্রে, উৎসবে, দুঃখে একত্র আছি। তোমার থেকে যে কেউ আমাকে বেশী ভালবাসিতে পারে, ইহা তো আমি জানিতাম না। কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে এখন সে স্নেহ, সতর্কতা আর দেখিতে পাই না! তোমার সমস্ত স্নেহ যেন ঐ বালকটির উপর যাইয়া পড়িয়াছে। ও তোমার কে? তুমি ওকে না দেখিলে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়। তোমার এমন চিত্ত-চাঞ্চল্য তো কখনও দেখি নাই। তাহার আহার

হইল কিনা, শতবার তুমি পাচককে জিজ্ঞাসা কর। সে কি কি দ্রব্য খাইতে ভালবাসে, এ সম্বন্ধে তোমার শত প্রশ্নে পাচক বিব্রত হইয়া পড়ে। রাত্রে বালকের খুব ভাল ঘুম হইয়াছিল কিনা, কিশোরকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর বারংবার দিতে হয়। তুমি ভাবিও না যে, তোমার মনোভাব কেহ বুঝিতে পারে না। আমার মনে হয়, একটা বালকের প্রতি স্বাভাবিকক্রমে যে ভালবাসা থাকা উচিত, তোমার স্নেহ তাহা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কাল দুইটি বালক কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল, তুমি শিকারে গেলে না সমস্ত বিকালটা হা হুতাশ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়াছ। কি হইয়াছে, বল দেখি। ইহার শেষ কোথায়?"

শ্যামল যুবরাজের কথায় খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, মুহূর্ত্তকাল তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। তিনি যুবরাজের হাত ধরিয়া বলিলেন—"সত্যই আমি বালকটিকে ভালবাসি। কেন উহার প্রতি আমার এমন টান হইল, তাহা আমি নিজেও জানি না। তবে তোমরা যাহা লক্ষ্য কর, আমার বাড়াবাড়ি যে এতটা দূর হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। ইহা লইয়া দেখিতেছি, পাচক ও কিশোরকের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে। সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্। আজ হইতে আমি সাবধান হইয়া যাইব। যুবরাজ, আমি তোমার দাসানুদাস। তোমার প্রতি আমার যদি যত্ন বা স্নেহের ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে আশ্রিত ও অনুগত বলিয়া আমাকে ক্ষমা কর।" বলিতে বলিতে শ্যামলের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে বিমর্ষভাবে চুপ করিল।

তাহার গদ্‌গদ কণ্ঠ ও চক্ষের জল লক্ষ্য করিয়া অনুতপ্তভাবে যুবরাজ বলিলেন,—"ছিঃ! গুরুভাই, তুমি এত ছেলেমানুষ! কি-ই বা করিয়াছ? কোন অন্যায় তো কর নাই, আমার কথা সুচিন্তিত নহে। এজন্য তোমাকে যা' তা' বলিয়া ব্যথা দিয়াছি। তুমি আমার যুদ্ধ-গুরু, শিক্ষা-গুরু, জীবনের রক্ষক, অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমার অপেক্ষা প্রিয় আমার কে আছে? তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

পরদিন হইতে দেখা গেল শ্যামল বালকটিকে এড়াইয়া চলে; ভ্রমেও সে তাহার নাম করে না। সে যে পথে যায়, শ্যামল তাহার উল্টা পথে যায়। তাহার মুখের ভাব কতকটা উদাসীন। অধর কেশপাশ ও সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক। যুবরাজের সঙ্গেই রাত্রিদিন কাটে। কখন কখনও যুবরাজ একা মৃগয়া করিতে গিয়াছেন বা বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, তখন যেন নির্জ্জন নদী-তীরে নিজকে নিজের কাছে পাইয়া শ্যামল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া এবং ধূতির খুটে চক্ষুর জল মুছিয়া মনের ব্যথা হ্রাস করিতেছে। একি ব্যথা? শ্যামল নিজেই বুঝিতে পারে না। মন একা থাকিয়া কেবলই বালকের কথা ভাবিতে চায়। তাহার চিন্তায় ডুবিয়া থাকিলে যেন সে বিষামৃতে স্নান করিয়া উঠে। এক দিকে অমৃত, অপর দিকে বিষের জ্বালা,—এমন ভাব তো সে কখনই অনুভব করে নাই।

তিন দিন এইভাবে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন রাত্রি এক প্রহর পরে যখন 'সব-দেওয়া-বাবা' তাঁহার নির্দ্দিষ্ট জপ করিয়া একা

প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন, তখন হঠাৎ শ্যামল আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। 'সব-দেওয়া-বাবা' বলিলেন—"বুঝিয়াছি, ব্যথা পাইয়াছ, বল তোমার দুঃখের কারণ কি ?"

শ্যামল বলিল—"আপনি বলুন এই বালকটি ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক, না পুরুষ।"

বাবাজি—"এই অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার মনে হইল কেন ?"

শ্যামল—"শুনুন বাবা, সকল কথাই বলি। কেন বলিতে পারি না, আমি ইহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। একদণ্ডও ইহাকে না দেখিলে ছটফট করিতাম এবং এত ব্যাকুলতা দেখাইতাম যে, আশ্রমের লোকজনেরা পর্য্যন্ত আমার বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করিয়াছিল। আমার সঙ্গে যে সহচর আসিয়াছেন, তিনি ইহা বিশেষভাবে টের পাইয়া আমাকে জানাইয়াছিলেন ও সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। আমি তদবধি তিন দিন মনকে নানারূপ বুঝাইয়াছি, কিন্তু ইহাকে আমি এক মুহূর্ত্তও ভুলিতে পারি নাই। এই তিন দিন তাহার সঙ্গে বেড়াইব না, স্থির করিয়াছিলাম, এমন কি কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। সে আমার মন এতটা অধিকার করিয়াছিল যে, আমি চোখ মেলিয়া এই আশ্রমের বাগান বা নীলাকাশের কিছুই দেখিতাম না, উহার মুখখানি চোখে ভাসিয়া উঠিত। ঘুমাইলে স্বপ্নে তাহাকে বারংবার দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। নিদ্রা-ভঙ্গের পর বুকের ভিতর অত্যন্ত ব্যথা বুঝিতাম এবং মনে হইত, আমি পাগল হইয়া যাইব।

"তথাপি আজি তিন দিন বালকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছি। কাল শেষ রাত্রে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে আমি আর ঘুমাইতে পারি নাই, চোখ বুঁজিয়া পড়িয়াছিলাম! উহাদের জানালার একটা কপাট খোলা ছিল, দেখিলাম সে ঘুমায় নাই, তাহার ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল, সে গালের উপর একখানি হস্ত রাখিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। সেই ঘরের বাতির আলোর একটা রেখা আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সে নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল এবং তাহার চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দু পড়িতেছিল, ইহা আমি নেত্রকণীনিকার বক্র দৃষ্টিতে দেখিলাম। কিন্তু আমি এত রাত্রিতে জাগ্রত আছি, তাহা তাহাকে বুঝিতে দেই নাই। সে উঠিয়া একবার আমার দিকের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কর[illegible]ড়ে আমাকে প্রণাম করিল এবং কত যে কাতর ভাবে কাঁদিতে লাগিল, তাহা আর কি বলিব! তাহার আঁটসাটা পোষাক রাত্রে শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং সেই দীপালোকে আমি [illegible] দেখিলাম, হীরার মূল্যবান্ কণ্ঠহার এবং হাতের উপর অঙ্গদ। যখন দুইখানি হাত শিথিল কাঁচুলি হইতে মুক্ত করিয়া জোড় হাতে সে আমাকে প্রণাম করিল, তখন দেখিলাম, তাহা অতি কোমল রক্তপদ্ম-দলের মত, সে হাত পুরুষের হইতে পারে না।

"তদবধি আমি পাগলের মত হইয়া গিয়াছি। আমি সংযম-ব্রত অবলম্বন করিয়া নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, অবশেষে এই পবিত্র আশ্রমে কে না কে একটা রমণীর মোহে আমার সমস্ত

তপস্যা বিসর্জ্জন দিব! অথচ ইনি যদি রমণীও হ'ন, তবে তাঁহার ভিতর আমি একটা সম্ভ্রম ও সংযত লজ্জার ভাব দেখিয়াছি। তিনি কোনদিন আমার বস্ত্রের সঙ্গে তাঁহার বস্ত্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে দেন নাই। পাছে আমি ছুঁইয়া ফেলি, এজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। একি প্রহেলিকা! ইহা হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। আপনি সংবাদ পাঠাইয়া আমাকে এখানে আনিয়াছেন। আমি নিকৃষ্ট চণ্ডাল। আমার দ্বারা যদি এই মন্দিরের পবিত্রতার একটি কালির আঁচও পড়ে, তবে বলুন, আমি আপনার কাছে আত্মহত্যা করিয়া মরিব।"

'সব-দেওয়া-বাবা' বলিলেন,—"তুমি একটু বস। আমি এইজন্যই তোমাকে এখানে আনাইয়াছি। ইনি শীঘ্রই তোমার পরিণীতা স্ত্রী হইবেন। তোমার ভাগ্যে দাম্পত্য-সুখ নাই, তবু এই বিবাহ বিধাতার নির্ব্বন্ধ। আচ্ছা, তোমার ধর্ম্মপিতা হংসরাজ তাঁহার মৃত্যুকালে তোমাকে কি কিছু দিয়াছিলেন, কিংবা কোন কথা বলিয়াছিলেন?"

শ্যামল সহসা যেন স্বপ্নোত্থিতের মত বলিল—"হাঁ তিনি একটা মাদুলী আমার হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন, যে দিন কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে তোমার বয়স ২৪ বৎসর পূর্ণ হইবে, সেই তিথিতে এই মাদুলীটি ভাঙ্গিবে। তাহাতে একখানি কাগজ পাইবে। এই মাদুলী পরিয়া কখনই স্নান করিবে না এবং সর্ব্বদা সুরক্ষিত রাখিবে; ইহা যেন সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

বাবাজী—"তুমি মাদুলীটি লইয়া আইস।"

শ্যামল তাহা কৃষ্ণসারের চর্ম্ম-নির্ম্মিত একটি কৌটার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল ; বাবার আজ্ঞায় তাহা লইয়া আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ কি তিথি ?

শ্যামল বলিল—"আজই কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি, আমার বয়স আজ ২৪ বৎসর পূর্ণ হইবে।"

বাবাজী—"তুমি আমার কাছে আসিবে, আমি তাহা জানিতাম। কিন্তু তুমি মাতুলীটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলে।"

শ্যামল—এই কয়দিন বালকের চিন্তায় আমি আত্মবিস্মৃত ছিলাম।"

বাবাজী—"যাহা হোক্, মাতুলীটি ভাঙ্গ।"

মাতুলীর ভিতর কাগজখানি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার মত অক্ষরে লেখা। সন্ন্যাসী বলিলেন—"ইহা তোমার মাতার হস্ত-লিপি, মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তিনি এই কাগজখানি লিখিয়াছিলেন !"

শ্যামলের চক্ষের জল কোন বাধা মানিল না। কাগজখানি মাথায় ঠেকাইয়া সে আদ্যন্ত পাঠ করিল। সে বুঝিল, তাহার পিতামহ মহেন্দ্র সেন এবং পিতা বিমলেন্দু সেন। তাহার পিতার অকাল মৃত্যুর পর হইতে তাহার মাতার উপর কৈবর্ত্ত সেনাপতির হিংস্র দৌরাত্ম্যের কথা, তাহার পর যে কষ্টে তিনি গৃহ ত্যাগনী হ'ন,—সে সমস্ত কথা তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার চোখের জলে কয়েকটা অক্ষর মুছিয়া গিয়াছিল।"

'সব-দেওয়া-বাবা' বলিলেন—"তোমার ধর্ম্মপিতার কনিষ্ঠ

ভ্রাতা শৈবাল রায় পাছে তাহার উপর কোন অত্যাচার করেন, এই আশঙ্কায় মৃত বজ্রধ্বজ মন্ত্রীর কন্যা কজ্জলিকা এখানে পুরুষের ছদ্মবেশে আছে। এই সিঙ্গুরের আশ্রম অতি প্রাচীন সন্নিকটবর্ত্তী পাল ও চন্দ্ররাজারা ইহার রক্ষক, এখানে কেহ আশ্রয় লইলে কোন অত্যাচারীর সাধ্য নাই, তাহার কেশ স্পর্শ করে। চতুস্পার্শ্বস্থ রাজাদের নিযুক্ত তৈলঙ্গ সৈন্যগণ ইহা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। শান্তাচার্য্য আমার বন্ধু, তিনি কজ্জলকে পুরুষের ছদ্মবেশে তাহার সখী কিশোরিকার সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহাদের পরিচয় বা ইতিহাস সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিতে পারিবে না, এই অনুরোধ আছে। এখনই সে জানিবে, তুমি চণ্ডাল নহ, তুমি সাভারের রাজবংশের উজ্জ্বল প্রদীপ, তোমার মাতামহও রাঢ়দেশীয় মহাকুলীন।"

তিনি কজ্জলকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহার সঙ্গে আসিল কিশোরিকা। তিনি তাহাকে বলিলেন—"কজ্জল, তুমি এই কাগজখানি পড়; তাহা হইলেই সকল কথা জানিতে পারিবে।"

কজ্জল ও কিশোরিকা উভয়েই জানিল শ্যামল চণ্ডাল নহে, সাভার-রাজবংশের মধ্যমণি। সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশ মত দুইটি পদ্মকুসুমের মালা কিশোরিকা গাঁথিয়া আনিল; তিনি গন্ধর্ব্ব-মতে ইহাদের মাল্য-পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন,—উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। যুবরাজ সকলই শুনিলেন এবং অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"বিবাহ হইয়া গেল, আমি সর্দ্দারকে সকলই জানাইব। রাজা ও সর্দ্দারকে জানাইয়া ব্যবহারিক মতে

বিবাহ বাজাসনে হইবে। কিন্তু এই দাম্পত্য সুখের হইবে না, বিধির নিয়তির জন্য তোমাদের প্রস্তুত থাকিতেই হইবে।"

তিনি যুবরাজকে বলিলেন—"তুমি দেশে ফিরিয়া যাও, ইহারা তিন জন এখানে কিছুকাল থাকিবে।"

বার

"চল যাই নীলাচলে।
খাইয়া প্রসাদ-ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাহিব কুতূহলে ॥"

—ভারতচন্দ্র।

*　　*　　*　　*

"জয় ব'লে আনন্দে মেতে একত্রে ভোজন ছত্রিশ-জেতে
বাগ্‌দি, কোটাল, ধোপা, কলুতে একত্র সমস্ত।
বিল্বপত্র জবার ফুল দেখ্‌তে নারেন চক্ষের শূল
কালী নাম শুন্‌লে কানে হস্ত ॥
কিবা ভক্তি, কি তপস্বী জপের মালা সেবাদাসী
ভজনকুঠুরী আইরি কাঠের বেড়া।
গোঁসাইকে পাঁচসিকা দিয়ে ছেলে সুদ্ধ করেন বিয়ে
জাত্যংশে কুলীন বড় নেড়া ॥"

—দাশরথী।

*　　*　　*　　*

"খাসা চীরা বহির্ব্বাণ রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকণ গুধুরী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে ॥

পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥
এক একজনের সঙ্গে ধুমুরী দু'টি দু'টি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি ॥
ভুকুলামির ভাবের ভাব জন্মে থেকে থেকে।
ক্ষণে ক্ষণে তখন বিষম উঠে ডেকে ॥
সে রসের রসিক নবশাখ্ লোক যত।
ওঠে ছোটে পায়ে পড়ে করে দণ্ডবত ॥
গুষ্ঠিসুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে।
মনে মনে ভয়, অপরাধী হয় পাছে ॥"

—রামপ্রসাদ।

* * * *

"পদ্মপলাশ নেত্র দু'টি আরক্ত নেশায়।
ঢালে সাজে, সাজে ঢালে সদাই গাঁজা খায় ॥
হাতে চিম্‌টে গলায় গাঁথা রুদ্রাক্ষ বিশাল।
গাঁজায় দেয় দম্, বলে বম্‌বম্, সদা বাজায় গাল ॥
অভিমানের হাঁড়ি করে নরে হেয় জ্ঞান।
জ্ঞানের তত্ত্ব সেই বুঝেছে, আর সব অজ্ঞান ॥
পাঁচটা চেলা, পাঁচটা অসুর এমনি বলবান্।
চক্ষুগুলি কুঁচের মত বয়সে জোয়ান ॥
বাহুগুলি লোহার গোলা তাহে মাথা ছাই।
খেয়ে উদোম ধর্ম্মের ষাঁড়, কিছু চিন্তা নাই ॥

—শিবনাথ শাস্ত্রী।

এক বৎসরের অধিক কাল যুদ্ধ চলিয়াছে। এই যুদ্ধে ধল্লা, কুরুঙ্গই, রোউয়া, সাভার, তেলেঙ্গা প্রভৃতি স্থানের জোয়ান ছেলেরা সকলেই রণাঙ্গণে। চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, ঢুলী, মালী, তেলী, নাপিত, ব্রাহ্মণ সকলেই এই যুদ্ধে আহত এবং বাজাসনের গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়া লড়িয়াছে।

এদিকে রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই বৃদ্ধ। সেনাপতি, যুবরাজ ও শ্যামল গৃহছাড়া। এই সময় বাজাসনের অধ্যক্ষ পরিব্রাজক ফাহাউচ্ নিজের ইচ্ছানুসারে অবারিত প্রভুত্ব চালাইয়াছেন। তেলেগু দেশীয় এক ধূর্ত্ত সিদ্ধার কথায় তিনি দুশ্চর তান্ত্রিক তপস্যা করিতেছেন। তিনি নিজে তো সিদ্ধিলাভ করিবেনই, বাজাসনের সমস্ত ভিক্ষুকে তিনি সিদ্ধির পথ দেখাইবেন। সিদ্ধিলাভের পর সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের আধিপত্য লাভ তিনি করিবেন। ভিক্ষু নিবাস নাম্নার গ্রামের মহারাজ্ঞী সর্ব্বময়ী "ভীষণা" কালী বিগ্রহকে সমস্ত জগৎ উৎসর্গ করিয়া তিনি অবাধ কর্তৃত্ব চালাইবেন। এই তান্ত্রিক ধর্ম্মের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। তাঁহার তান্ত্রিক গুরুর শিক্ষা মত কতকগুলি উৎকট পাহাড়িয়া বিষাক্ত লতাপাতা মন্ত্রপূত করিয়া তাহার অঞ্জন চোখে দিতে দিতে তাঁহার একটি চোখ প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার এই সকল অনুষ্ঠানের উপর বিশ্বাস অটুট। তান্ত্রিক ব্যাভিচারের ফলে নানাবিধ উৎকট ব্যাধি তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়াছে। সেই সকল ব্যধির ফলে তাঁহার শিরা উপশিরা ফুলিয়া শরীরের উপর এক এক স্থানে মাংস পিণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে

মনে হয়, যেন কণ্টকলতা জড়িত অতি প্রাচীন বৃক্ষ।" মনে হয় যেন তাঁহার শিরা উপশিরা বহুল দেহে কতকগুলি সরীসৃপ লাগিয়া আছে। অতিরিক্ত সুরাপানের জন্য তাঁহার চক্ষুদৃষ্টি জবাফুলের মত লাল। তাঁহার দেশ ও জাতির স্বভাব-গুণে চক্ষুদু'টির ভ্রূ উর্দ্ধে এবং চোখের গোলক ক্ষুদ্র।

অতি প্রত্যূষে যখন ভ্রমরেরা ফুল ফুটিল কিনা জানিবার জন্য বাগানে প্রথম জাগিয়া গুণ গুণ করিয়া ঘুরিয়া দেখে, তখন তিনি ফুল কুড়াইবার জন্য তথায় প্রবেশ করেন। স্বহস্তে "ভীষণাকালীর" পায়ে অঞ্জলি দিয়া তিনি অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যে রত হন। তাহার ফলে শত শত বৃহদাকৃতি রক্ত পীপড়ার দংশনে তাঁহার পা দু'টি ফুলিয়া গিয়াছে। দেবীর পূজায় নিবেদনের জন্য নিজ হাতে ফুল কুড়াইবার সময় কত যে বানর নখ দিয়া তাঁহার নাক আঁচড়াইয়া দিয়া যায়, তাহার ক্ষত শুকায় না। মন্দিরের একটা নিভৃত স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে ধর্ম্মচক্র ঘুরাইবার সময় কত যে বৃশ্চিক ও বিষাক্ত পোকা তাঁহাকে দংশন করিয়া যায়, তাহাতে তিনি উহু পর্য্যন্ত করেন না! তাঁহার ধর্ম্ম "নিধিবাদ", "এই জগৎ আমার"—তপঃ প্রভাব দ্বারা ইহার অধিকার পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। বাজাসনের প্রকাণ্ড একটা গৃহে মৃগচর্ম্ম, বনজলতার কমণ্ডলু, ধর্ম্মচক্র, তাম্রপাত্র সোণা ও রূপার পুষ্পাধার, কত কি আছে, কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র লোলুপতা নাই; পঞ্চমকার তাঁহার অভিলষিত লক্ষ্য। তিনি জানেন, বিস্তৃত বাজাসন রাজ্যে তাঁহার অনুশাসন হেলা করিতে পারে, এমন

একটি লোকও নাই। তাঁহার মুখ শ্মশ্রুবিরল, ঘাড়ের কাছে, প্রকাণ্ড একটি অর্ব্বুদ।

তিনি বেলা এক প্রহরের সময় ভিক্ষু নিয়তবজ্রকে বলিলেন—"তোমার খবর কি?"

ভিক্ষু নিবেদন করিল,—"সকলই হইতেছে। কিন্তু আমাদের এই সকল কাজ এত ব্যাপকভাবে চলিয়াছে যে, কতকটা কাণঘুষা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিতেছে।"

উগ্রস্বরে ফাহাউচ্ বলিলেন,—"খুব সাবধান, কেহ যেন ঘুণাক্ষরে কিছু টের না পায়।"

ভিক্ষু কি বলিতে যাইয়া একটু দ্বিধার ভাব দেখাইল। আচার্য্য বলিলেন—"বল, অমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? নির্ভয়ে সকল কথা খুলিয়া বল।"

ভিক্ষু বলিল—"আমরা যে সকল গর্হিত কাজ করিতেছি, তাহার জন্য কি আমরা জন্ম-জন্মান্তরে দায়ী হইব না?"

আচার্য্য—"তুমি যে হাসাইলে! ধর্ম্মকার্য্যের জন্য যে যাহা করে, পৃথিবীর তুলাদণ্ডে তাহার বিচার হয় না। দাতা কর্ণ যে তাঁহার পত্নীর সঙ্গে করাত ধরিয়া স্বীয় পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নরমাংস খাওইয়াছিলেন, ইহা কি সাংসারিক হিসাবে খুব দূষণীয় নহে? স্বয়ং তথাগত ২৯ বৎসর বয়সে যে বৃদ্ধ মাতাপিতার বুকে শেল হানিয়া, স্বীয় তরুণী ভার্য্যা ও অপোগণ্ড শিশুকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বনে গিয়াছিলেন, তাহাতে কি স্বীয় পরিবারে ও রাজ্যময় অশান্তি ও শোকের সৃষ্টি করে নাই? এই

সকল কথা রাখিয়া দাও। দুর্ব্বল হইও না। বাজাসন তপস্যার স্থান, বাজাসন ভূতলে স্বর্গ, বাজাসন সুখাবতীর সোপান গড়িবার স্থান। ইহা এই দেহকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধনা করিবার স্থান; ইহাতে পুরোহিতের নীতিবাদের দুর্ব্বলতা নাই। এখানে নির্ব্বিচারে গুরুর আজ্ঞা পালন করাই ধর্ম্ম।

ভিক্ষু—"ছেলেগুলি মৃত্যুকালে যে ছট্‌ফট্‌ করে, তাহাদের মায়েদের যে কি আকুলি-বিকুলি, তাহা যদি দেখিতেন, তবে বোধ হয় আপনারও চোখে তাহা অসহ্য হইত।"

আচার্য্য—"নিয়তবজ্র, তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল, কাপুরুষ। তোমার পক্ষে এই দুরারোহ সিদ্ধির পথে আসাই অন্যায় হইয়াছে।"

ভিক্ষু—"আচার্য্যদেব, আমাকে মুক্তি দিন, আমি আর পারিব না।"

আচার্য্য—"যাও, তুমি ধ্যান-ধারণা করিয়া ধর্ম্মচক্র চালাও গে। সিদ্ধির পথে যাইও না এবং আমাদের গোপন সাধনার কথা প্রকাশ করিও না।"

নত মস্তকে প্রণাম করিয়া ভিক্ষু নিয়তবজ্র চলিয়া গেল। তখন ডাক পড়িল অমিতাভ বজ্রের।

আচার্য্য বলিলেন—"আজ অমাবস্যা, শনিবার। কতগুলি চণ্ডালের শব সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ?"

অমিতাভ—"আটটি হইয়াছে। তিন সপ্তাহ ধরিয়া ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া করিয়া আজই সকালে তাহাদিগকে শেষ করা হইয়াছে।"

আচার্য্য—"বাস্, এইত চাই।"

আমিতাভ—"আচার্য্যদেব, রোড়ুয়া গ্রামে প্রায় দশ হাজার ঘর চণ্ডাল। তাহারা যে নিঃশেষ হইতে চলিল! আমরাই ভিষক্, প্রথম হইতেই ছেলেদের জননীরা তাহাদের চিকিৎসার ভার আমাদের উপর ছাড়িয়া দেয়। তখন হইতে ধীরে ধীরে বিষ প্রবেশ করাইয়া অমাবস্যা তিথিতে শনি কি মঙ্গলবার পাইলে সেই দিনই ছেলের সকল চিকিৎসার প্রয়োজন শেষ করিয়া ফেলি।"

আচার্য্য—"এইত চাই। তুমি সরল ও তেজস্বী। এই ভাবে মৃত্যু হইলে মানুষকে জন্ম মৃত্যুর চক্রে ক্রমাগত ভ্রাম্যমান হইতে হইবে না, একেবারে নির্ব্বাণ পাইবে এবং যে সকল মহাতপা, উগ্রবীর্য্য ভিক্ষু ইহাদের উপর আসন করিয়া বসিয়া তপস্যা করিবেন, তাঁহাদের অলৌকিক সিদ্ধিলাভ হইবে।"

অমিতাভ—"তাহা যাহাই হউক; আচার্য্যদেব, আমাকে রেহাই দিন। গুরুদেব, আমি আর পারিব না। কাল সেই কিশোর বালকটির মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা দেখিয়া তাহার বিধবা মাতা যেরূপ আছাড়ি-বিছাড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল, শব যখন রাজাদেশে বাজাসনে লইয়া আনা হইল, তখন শাবকহীন ব্যাঘ্রীর মত তাহার মাতা যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া আত্মঘাতী হইতে ছুটিল, তাহাতে আমার নিজ মায়ের কথা স্মরণ করিয়া আমি বিহ্বল হইয়া একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভিক্ষু গৌতম-প্রসাদ আমাকে না ধরিয়া ফেলিলে আমি পড়িয়া যাইতাম। এইরূপ ধর্ম্মকার্য্যে আমার আর রুচি নাই, আমাকে রেহাই দিন।

এই অনুষ্ঠান আমার ধাতে. সহিবে না। আমি এরূপ সিদ্ধি, এরূপ নির্ব্বাণ চাহি না।”

আচার্য্য—“তোমরা দেখিতেছি একান্ত অযোগ্য। এ আশ্রমে কেন মরিতে আসিয়াছিলে? যাহা হউক মণিবজ্রকে আমার কাছে পাঠাইয়া দাও। এই সকল সাধনার কথা যেন অপর কেহ না জানে। তুমি গুহায় বসিয়া ধর্ম্মচক্র চালাও গে।”

প্রণাম করিয়া ভিক্ষু অমিতাভ চলিয়া গেল; মণিবজ্র আসিল।

আচার্য্য ফাহাউচ্ বলিলেন—“আজ যে আটটি চণ্ডালের শব আসিয়াছে তাহা কাহাকে কাহাকে দিলে?”

মণিবজ্র—“তাহার একটি লইলেন আচার্য্য ইয়ান্ সেন, একটি লইলেন আচার্য্য রত্নগর্ভ। আর বাকি ছয়টি যথাক্রমে শ্রীস্বামী সিন্‌সিন্, কম্বলপাদ, বিরূপাক্ষ, সিদ্ধকাম ও ওকাকুরা লইয়াছেন। শব দেওয়ার হুকুম দিন।”

আচার্য্য—“বেশ, তাহাই হইবে।

মণি—আচার্য্য দেব, চণ্ডালপাড়া যে এই এক বৎসরেই উজাড় হইয়া গেল! ইহারা বাজাসন রাজ্যের ভিত্তি-স্বরূপ, আপদকালে ইহাদের বাহুই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই বিপুল সাম্রাজ্যের সৌধনির্ম্মাণ করিতে ইহাদের দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত উপাদান জোগাইয়াছে। এখন ইহাদের বহুলোক যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে; বাজাসনের শ্রমণ ও ভিক্ষুদের জন্য আমরা বাকিগুলিকে মারিয়া ফেলিতেছি। কত বৎসর ধরিয়া আমাদের এই গুপ্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্বাভাবিক ভাবে চণ্ডালের

শনি মঙ্গলবার অমাবস্যায় মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন্। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি বা কষ্টের কারণ থাকিত না। কিন্তু এইরূপ অস্বাভাবিক ভাবে মারিয়া ফেলিয়া যে, আমরা আমাদের বলক্ষয় করিতেছি! কুরুঙ্গুই, মলঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর নমঃশূদ্র আছে। আমরা কি জনবিরল চণ্ডাল-পল্লী ছাড়িয়া এই নমঃশূদ্র পল্লী হইতে শব সংগ্রহ করিব?"

আচার্য্য—"না, তাহা কখনই হইতে পারে না। শাস্ত্রোক্ত চণ্ডাল জাতিই আমাদের ধর্ম্ম—কার্য্যের সহায়। নমঃশূদ্র ও কৈবর্ত্তাদির দ্বারা ইহা হইবে না; মায়ার কান্নাকাটি শুনিলে কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন ও সিদ্ধির জন্য এই পথে আসিয়াছ। এ কাজ দুর্ব্বল ও অশক্তের জন্য নহে।"

মণিবজ্র—"আচার্য্য মহারাজ, আমি সেই হীন উপাদানে গড়া নই। আমার দ্বারা বাজাসনের তান্ত্রিক ধর্ম্ম যদি কিছুমাত্র উজ্জ্বল হয়, তবে জানিবেন, এমন কোন দুষ্কর কার্য্য নাই, যাহা হইতে আমি নিবৃত্ত হইব।"

আচার্য্য—"যাও, তুমি পুরুষের বাচ্চা, সেইরূপ কথাই বলিয়াছ।"

এই তান্ত্রিক আচার্য্য ধর্ম্মের নামে কত যে কুকর্ম্ম করিতেছিল, তাহাতে সমস্ত বিহারটি নীতি-চেতনা হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক এক বিপুল জনপদে সংক্রামক বিষ ছড়াইয়া দিয়াছিল।

অপর-দিকে সহজিয়া একাভিপ্রায়ীর দল; তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক শ্রেণী তান্ত্রিক, তাহারা স্ত্রী-পুরুষে একত্র

বসিয়া পঞ্চমকারের সাধনা করে, অপর এক শ্রেণী ভাব-রাজ্যে আরোহণ করিতে চেষ্টিত। শেষোক্ত দলে কোন তান্ত্রিক সাধনা নাই। দেহ-সাধনা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহারা যে কত কৃচ্ছ্র সহ্য করে, তাহা আর কি বলিব? তাহারা প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে; তজ্জন্য তাহারা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে। গুরুপরিজন পরিত্যাগ করিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া ঘর ছাড়িয়া যাওয়া গৌরবজনক মনে করে। প্রণয়ী ও প্রণয়িণীরাই ইহাদের উপাস্য। ইহারা বলে—"সীতা-সাবিত্রীর দেহ পবিত্র হইতে পারে, এই হিসাবে তাঁহারা সতী। কিন্তু প্রেমের সন্ধান তাঁহারা কোথায় পাইবে? তাঁহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইবেন, এই ভরসায় সহমরণ যান, তাঁহাদের শ্মশানে মঠ উঠিবে, লোকেরা ছড়া বাঁধিয়া তাঁহাদের প্রশংসা গাহিবে, স্বজনেরা তাঁহাদিগকে লইয়া গৌরব করিবে, ইহাই তাহাদের মূলতঃ লক্ষ্য। সুতরাং তাহাদের মধ্যে প্রেম আছে কিনা এবং থাকিলেও কতটুকু আছে, বিভিন্ন উপাদান হইতে তাহা বাছিয়া লইবার উপায় নাই। কিন্তু যাহারা প্রেমের জন্য সর্ব্বত্যাগী, কলঙ্ক যাহাদের অঙ্গের ভূষণ, স্বামীকুল, পিতৃকুল, উভয় কুলই যাহারা কুষ্ঠগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ত্যাগ করিয়াছে, সেই নিন্দার তিলকপরা সর্ব্বত্যাগী প্রেমের যোগী ও যোগিনীরাই প্রেমের প্রকৃত সাধনা দেখাইতেছেন।"

এদলেও অনেক লোক ভিড়িয়াছে। কারণ তরুণ বয়সে যৌন প্রেমের আকর্ষণ বড় শক্তিশালী। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ দলে

টিকিয়া থাকিতে লোক পাওয়া যায় না। কারণ এই সকল প্রেমিক-প্রেমিকাকে সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধে উঠিতে হয়। "স্ত্রী হিজ্‌রে, পুরুষ খোজা, তবে হবি গুরুভজা"—ইহাই তাহাদের আদর্শ। ইহারা প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া প্রলোভনের উর্দ্ধে উঠিতে চান। প্রণয়ী ও প্রণয়িনী এক শয্যায় শুইয়া কোনরূপ ইন্দ্রিয়-উত্তেজনার প্রশ্রয় দিবেন না। ইহাদের দেহকে "কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ" করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহা সুখ-দুঃখের অনুভূতি-বর্জ্জিত হইবে। তাঁহারা যে রাজ্যে যাইতে চেষ্টিত, যেখানে "বাহিরের দুয়ার বন্ধ, ভিতর দুয়ার খোলা।" বাহিরে যাহারা দেখিবেন, তাঁহারা মনে করিবেন, ইহারা নিতান্ত নির্লজ্জ, অসৎ। কারণ ইহারা ভিতরে যেরূপ, বাহিরে তাহার অন্যরূপ দেখাইয়া থাকেন।—ইহাদের গুরু প্রেমানন্দ বলেন,—"তোরা 'আমরা বড় সাধু', 'আমরা বড় প্রেমিক', এরূপ ঘোষণা করিবি না, বরং নিজেকে অন্যরূপ দেখাইতে চেষ্টা করিবি। কিন্তু ভিতরে সৎ থাকিবি 'তোরা না হইবি সতী', সতীত্বের বড়াই বা ঘোষণা করিবি না। "না হবি অসতী" ভিতরে খাঁটি থাকিবি, তবেই প্রেম-ধর্ম্ম কি বুঝিতে পারিবি।"

এই দলের ধর্ম্মের প্রধান উপাদান নিষ্ঠা। বারংবার হাত বদ্‌লান, মালা বদ্‌লান এই রাজ্যের রীতি নহে। "প্রেম করিয়া ভাঙ্গে যে, সাধন-অঙ্গ পায় না সে।" প্রেম করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া অন্য পাত্র ধরিলে সাংসারিক হিসাবে সে সুখী হইতে পারে, কিন্তু সে কিছুতেই সাধনার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। যত কৃচ্ছ্র,

যত নির্য্যাতন, যত দুঃখ সহ্য করিয়া এক-নিষ্ঠ থাকিবে। নিজের যাহা কিছু আছে, তাহা অপরের পায়ে নিবেদন করিয়া দিবে। 'সব-দেওয়া-বাবা' এই প্রেমের সুখ্যাতি করিয়াছেন। কিন্তু সেরূপ একনিষ্ঠ প্রেমিক পাওয়া যায় না। প্রেমানন্দ স্বামী বাজাসনের এক কোণে পড়িয়া থাকিতেন। নীল রঙ্গের আলখাল্লা পরিতেন ও চীনদেশী সাধু লোৎসুর মত প্রচার করিতেন। তিনি বলিতেন—"পিতলের বুদ্ধ আগুন লাগিলে গলিয়া যায়, মাটির বুদ্ধ জল লাগিলে নষ্ট হয়, কাঠের বুদ্ধকে উঁইএ কাটে, তোরা এই সকলকে পূজা করিয়া কি লাভ করিবি? সবার উপর মানুষ সত্য, মনের মানুষ পাইলে তাহাকে ধরিয়া পূজা কর। দেখিবি প্রতিদিনের পূজার সঙ্গে তোরা সাধনার রাজ্যে কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হইতেছিস্। বিগ্রহ পূজা অতি সহজ, যখন তোরা মনে করিবি, তখনই বিগ্রহের মুখে হাসি দেখিতে পাইবি, কিন্তু সতত-চঞ্চল, অস্থির-বুদ্ধি, রাগবিদ্বেষ প্রভৃতির বশীভূত মানুষকে খুশী করা বড় কঠিন। এই সাধনা সকল সাধনার থেকে কঠিন। প্রেমের পাত্রের সমস্ত বিধান হাসি মুখে গ্রহণ করিবি।"

প্রেমানন্দ আরও বলিতেন—"তোরা কৃষ্ণ-বিষ্ণুর পূজা কর্‌ছিস। বলতো অন্ধব্যক্তি কৃষ্ণের নব-নীল মেঘের মত বর্ণের ধারণা করিবে কিরূপে? জন্মবধির বাঁশীর সুরের ধারণা করিবে কিরূপে? তাহাদের কাছে তোদের কৃষ্ণ মিথ্যা। কিন্তু সবার উপরে তুই যে মানুষকে বড় করিয়া রাখিয়াছিস্, সেই মানুষই তোর মন, তোর ভাব সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মভাবে বুঝাইয়া তোকে

সাধনার পথে লইয়া চলিবে। কিন্তু এই পথে সাধক বেশী নাই। অনেকে প্রবেশের জন্য ভিড় করে, কিন্তু প্রায়ই ভিতরে ঢুকিতে ঢুকিতে ফিরিয়া যায়। এই পথের সাধক 'কোটিকে গোটিক হয়।'

•

বাজাসন-বিহার এই সকল ভিক্ষুতে পূর্ণ। রাত্রিকালে এই মহা অট্টালিকা ও কানাই নদের পূর্ব্ব পার একটা বীভৎস পাপের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। কোথাও নদের তীরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বৌদ্ধ তান্ত্রিক উলঙ্গিণী কোন নারীকে লইয়া সাধনা করিতেছে। তান্ত্রিক সাধক শবের মত পড়িয়া আছে। তাহার উপর সেই উলঙ্গিণী নারী লোল-রসনা হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেছে। তাহাদের কোন বিকার নাই। এইভাবে ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যার সাধনা চলিতেছে। অন্যত্র একটি মৃতের শব শ্মশান হইতে তুলিয়া লইয়া কোন তান্ত্রিক মদ্যপাত্র হাতে বীভৎস ভাবে সেই মৃত-দেহের উদর হইতে নাড়িভুড়ি বাহির করিয়া খাইতেছে। কেহ বা ইহা হইতেও বীভৎস সামগ্রী ভোজনে নিযুক্ত; মনে হইতেছে, ইহারা শকুনী হইতেও অধম। উৎকট বিষ-প্রয়োগে নিহত কত জননীর প্রাণ-প্রিয় পুত্রগণের শবের উপর আসীন তান্ত্রিক সাধক পিশাচ ও দৈত্য-দানবের বায়ব্য মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া শূন্যহস্তে যেন খড়্গ ধারণ করিয়া আছে—এই ভাবে খড়্গাঘাতের ভঙ্গিমা করিয়া

সেই কাল্পনিক, বিকট দৈত্য-দানবকে 'নেতি' 'নেতি' বলিয়া তাড়াইতেছে। কোন স্থানে একটি মৃতের কৰ্ত্তিত বাহু বায়ুতে ঝুলাইয়া কোন ভৈরবী সেই বাহুতে তাহার ইষ্টদেবের ভর হইয়াছে, এই ঘোষণা করিতেছে। শত শত ভিক্ষু আসিয়া সাক্ষ্য দিতেছে, হাঁ, গুরুকে সেও হাতের কাছে দেখিতে পাইতেছে। কি সুন্দর তাঁহার হাসি! তাঁহার গেরুয়া উত্তরীয়, তাঁহার গ্রীবায় কি অপূৰ্ব্ব মাধুরী বিলাইয়া ঝুলিতেছে! তাঁহার বক্ষ বিশাল, চক্ষু বিশাল, তাঁহার দেহ মাংসপেশীবহুল, বলিষ্ঠ কি অপূৰ্ব্ব রূপ! কতকগুলি রমণী সেই ভৈরবীর পা ধরিয়া বসিয়া আছে ও মুহুর্মুহুঃ তাহাদের নিজ কপালে তাহার পদরজঃ লেপন করিতেছে, ভৈরবীর কণ্ঠে জবাফুলের মালা, রক্ত-চন্দনের ফোঁটা ও ত্রিপুণ্ড্রক।

কানাই নদের কূলের সেই অংশ প্রায় এক মাইল স্থান-ব্যাপী, অমাবস্যা রাত্রিতে তথায় এইরূপ বীভৎস উৎসব চলিতে থাকে। সহজিয়া গুরু কতকটা তরুণ বয়স্ক, একস্থানে বসিয়া উপদেশ দিতেছেন। রমণী-শ্রোতারা সেই সকল উপদেশ বেদ-বাক্য হইতেও বেশী বিশ্বাস করিতেছে। তাহার ভাষা হেঁয়ালীপূর্ণ, গান হেঁয়ালীপূর্ণ। কখনও গানে বলা হইতেছে—"বাদুর, তোর লেজ কেন নীচের দিকে ঝোলে, তুই সন্ধ্যাকালে কেন চক্ষে দেখিস্, দিবালোকে পলাইয়া থাকিস্ কেন?" কোন গানে বলা হইতেছে— "ওরে দুধের পাহারায় বিড়াল-প্রহরী নিযুক্ত করেছিস্।"

এই সকল রহস্য গুরু যেমন বুঝাইতেছে, রমণী-শ্রোতারাও সেইরূপ বুঝিতেছে। গুরুজীর প্রসাদী উচ্ছিষ্টের জন্য সে কি

উত্তেজনা! রমণীরা গুরুর মুখে মুখ লাগাইয়া উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে, সে জন্য কি প্রতিদ্বন্দিতা! কি আগ্রহ! কাহারও গণ্ড লজ্জায় আরক্তিম, তবুও সমস্ত সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সে গুরুর উচ্ছিষ্টের জন্য উতলা হইয়া তাহার ক্রোড়ের উপর যাইয়া দশাপ্রাপ্ত হইতেছে। কুলবধূরা যেন একদিনের জন্য তাহাদের বন্দীশালা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতার মুখ দেখিয়াছে। তাহাদের সকলেই প্রফুল্ল, সকলেই উত্তেজিত। সেই প্রসাদ লইয়া কাড়াকাড়ির উত্তেজনায় তাহাদের সাড়ী ও নীবি-বন্ধ শিথিল হইয়াছে, সেদিকে দৃক্‌পাত নাই। গুরুজির মুখ ধোওয়াইবার জন্য পুনরায় বহু কোমল হস্ত প্রসারিত হইতেছে,—গুরু সেই আনন্দ-সমুদ্রে খেই পাইতেছে না।

অপর দিকে জয়-ঢাক ও কাড়া-নাকড়া বাজিয়া উঠিয়াছে। আচার্য্যের আদেশে শত্রুশিবির হইতে কতকগুলি বন্দীকে তথায় পাঠান হইয়াছে। আজ তাহাদের মহা-বলির দিন। "ভীষণা," লোল-রসনা মা, তুমি কি সন্তানকে এইভাবে গ্রহণ কর? পুরোহিত পূর্ণাভিষিক্ত, সেই সকল হতভাগ্য বলি একে একে দেবীর জন্য প্রাণত্যাগ করিল। রাশি রাশি ফুল্ল রক্তপদ্মের সঙ্গে সেই রক্তার্দ্র নরমুণ্ড দেবীর পদতলে শোভা পাইতে লাগিল। "ভীষণা" যেন তখন সেখানে আরও ভীষণা হইলেন। কাড়ানাকড়া থামিয়া গেল। এক ভক্ত সেই নরমুণ্ডের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া গাহিতে লাগিল—"লোল-রসনা করাল-বদনী।"

সেই সুবিস্তৃত পূজা-মণ্ডপ-সংলগ্ন একটা প্রকোষ্ঠে নানা মত-বাদী সিদ্ধিকামী তান্ত্রিকেরা শাকম্ভরী-সংহিতা, কপিঞ্জল সূত্র, নাগোজী ভট্ট, মল্লিকাবর্জ্জন-পদ্ধতি, নাগার্জ্জুন-পদ্ধতি প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থ লইয়া মহা কোলাহলের সঙ্গে বিচার করিতেছে। তাহারা চৈনিক মতের উপরই বেশী জোর দিতেছে। মূর্ত্তিভেদে কালিকার নানা বিগ্রহের উপাসক সেখানে প্রচুর সম্মান লাভ করিয়া বিশাল জবামাল্য গলায় দোলাইয়া স্তোত্র পাঠ করিতেছে। মহাকালিকা, সিদ্ধকালিকা, রুদ্রকালিকা, দক্ষিণকালিকা, বিদ্যুজ্জ্বালা করালিকা প্রভৃতি বিগ্রহ তিব্বতীয় পন্থায় পূজা পাইতেছেন। এদিকে পুস্তকাধারে স্বর্ণাক্ষরে "মুণ্ডমালা", "কালীহৃদয়-সাম্প্রদায়িকা", "চামুণ্ডাতন্ত্র", "নীলতন্ত্র", "কল্পসূত্র", "কালীকুলসদ্ভাব", "সোম-ভুজনাবলী", "কামকূট শ্রীক্রম" প্রভৃতি পুস্তকের নাম সংযুক্ত মলাটের অংশ দেখা যাইতেছে। ভীষণার পূজারীর উদাত্ত, গম্ভীর কণ্ঠোত্থিত শ্লোকের আবৃত্তি ঢাকের বাদ্যের নিনাদ অতিক্রম করিয়া সেই ভীষণা-মন্দিরকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। পূজারী আবৃত্তি করিতেছেন :—

"অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং করাল বদনাং শুভাম্।
মুণ্ডমালাবালকীর্ণং মুক্তকেশীং স্মিতাননাম্॥
মৃত হস্তসহস্ৰৈস্তু বদ্ধকাঞ্চীং দিগংশুকাম্।
বিপরীতরতাসক্তাং ঘোরদংষ্ট্রাং শিবৈঃসহ॥
রক্তপূর্ণ মুখাম্ভোনাং মদ্যপান প্রসক্তিকাম্।
বিগতায়ুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীম্॥"

এই দৃশ্যের অদূরে আর এক চিত্র। ঘুঁটে ফুলগুলি দীঘির পাড়ে ফুটিয়া আছে, যেন সিংহের রক্তবর্ণ থাবা। বাজাসনের স্তম্ভগুলির নীচে এবং অলিন্দ হইতে সেই ঢক্কা ও অপরাপর বাদ্যের নিনাদে তাড়িত হইয়া শ্বেতাভ ঈষৎ রক্তিম পায়রাগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে দীঘির পাড়ের বৃক্ষ-পল্লবে আশ্রয় লইয়াছে, মনে হইতেছে, যেন তাহারা পদ্ম-কুঁড়ির একটি হার তৈয়ারী করিয়াছে। অদূরে তমাল-বীথি জমাট আঁধারের মত দাঁড়াইয়া আছে, যেন তাহারা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইবে। মন্দির হইতে অগুরুর ঘন নীল ধোঁয়া নিঃসৃত হইয়া আকাশ ভারাক্রান্ত করিতেছে এবং মন্দির হইতে বিকীর্ণ দীপালোকে সেই অমাবস্যা রাত্রিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রক্তাশোকগুলি তাহাদের বৃক্ষপত্র গুচ্ছের মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে, যেন ঊষা দেবী আসিবার পূর্ব্বেই ভোরের টুক্‌রা টুক্‌রা রোদ পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সমস্ত বাজাসন অঞ্চল ব্যাপিয়া কি এক ভীতি রাজত্ব করিতেছে! সংক্রামক ব্যাধিতে চণ্ডাল-পল্লী জনশূন্য হইতেছে, —এইরূপ জনশ্রুতি শোনা যাইতেছে। কিন্তু কেহ কেহ ফিস্ ফিস্ করিয়া এমন সকল কথা কহিতেছে, যাহা "চুপ চুপ" প্রভৃতি নিষেধাত্মক বাক্যে শ্রোতারা থামাইয়া দিতেছে। বণিক, কুম্ভকার, কৈবর্ত্তদের কুলবধূরা রাত্রে পূজা দিতে আসে এবং তাহাদের স্বামীদের বহু নিষেধ-সত্ত্বেও তাহারা রাত্রে বাজাসন মঠেই থাকিয়া যায়।

এক সম্ভ্রান্ত কৈবর্ত্ত তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলিল,—"কই, আমার স্ত্রী তো কখনও এমন ছিল না। এই বাজাসনের গুরুর কাছে যাইয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার পর হইতে সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে।"

—"সে কি? তাহার পর দিন কি সে বাড়ীতে ফিরে নাই?"

—"ফিরিয়াছে বই কি?"

—"তবে?"

—"তবে আর কি? যেমনটি সে ছিল, তেমনটি আর তাকে পাই নাই।"

—"সে ব্যভিচার করে, এমন কোন সংবাদ পাইয়াছে?"

—"তাহা কিছু পাই নাই, কিন্তু ব্যাভিচার করিলেও তাহার সংসারের কিছু আসক্তি থাকিতে পারিত। কিন্তু ভাই, তাহাকে আমি একেবারে হারাইয়াছি। দিনরাত্র আমার সঙ্গে কথা বলিলেও যাহার কথা ফুরাইত না, এখন সে আমার সঙ্গে দু'টি কথা বলিয়াই বিরক্ত হয়। আমার আহার, জলখাবার, এ সকলই দাসীর কৃপার উপর নির্ভর করে। সে ভ্রমেও রান্না ঘরে যায় না। পূর্ব্বে 'এটুকু খাও', 'ওটুকু খাও' বলিয়া কত আদর করিয়া খাওয়াইত, ও তাহার নিজ হস্তের রান্না আমার কিরূপ লাগিত তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিত, এখন না খাইলেও একবার খোঁজ করে না। সারাদিন খাটিয়া সায়াহ্নে বাড়ীতে আসিয়া শুনি, তিনি পূজা দিবার জন্য নান্নারের কালী-বাড়ীতে গিয়াছেন। আগে আমার শয্যায় মলিনতার লেশমাত্র থাকিত না, এখন তাহা

ধূলা বালিময়। পূর্ব্বে বাগানের ফুলগুলি তুলিয়া কত যত্নে আমার জন্যে মালা গাঁথিত, এখন সে পাঠ উঠিয়া গিয়াছে। কি বলিব ভাই, শত দিক দিয়া আমার সুখের কোঠায় শূন্য পড়িয়াছে। কখনও দেখি, সে কত যত্নে দাসীদের দিয়া বেণী সজ্জা করিতেছে, মূল্যবান্ শাড়ীগুলি বাহির করিয়া তাহা পরিবার জন্য সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিতেছে, গহনা পরিতেছে,—কিন্তু যখন অনেক রাত্রে আমার কাছে আসে, তখন একটা ভিখারিণীর বেশে আসিয়া শয্যার যে ধারটায় আমি শুই, তাহা যেন ঘৃণায় ত্যাগ করিয়া অপর দিকটায় শুইয়া তখনই ঘুমাইয়া পড়ে। যাহার একটুখানি হাসি দেখিলে আমি হীরা, মণি, পান্না চাই না, আমার কাছে এত দুর্লভ সেই হাসি, বাজাসনের পথে সে সখীদের সাথে যাওয়ার সময় কত স্ফুর্ত্তির সহিত সেই হাসি অকাতরে বিলাইয়া যায়,—কিন্তু যে স্বামী সেই হাসিটুকু পাইবার জন্য একেবারে হাত পাতিয়া আছে, সেই চির-বঞ্চিত হতভাগ্যের জন্য সে তাহা কোথায় হারাইয়া ফেলিয়া আসে! কোন বহুমূল্য বস্ত্র বা অলঙ্কার দিলে পূর্ব্বে সে কত গৌরব বোধ করিত, কিন্তু এখন ঘৃণার সহিত মুখ বাঁকাইয়া তাহা অতি তাচ্ছিল্য সহকারে কোথায় অযত্নে রাখিয়া দেয়! বন্ধু বল, কোথায় গেল আমার সেই সোনার প্রতিমা, কোথায় গেল সেই প্রাণ-ঢালা সোহাগের দান, কোথায় গেল আমার সেই রূপসী রূপ-মঞ্জরী? এ অয়স্কান্তমণির কঠিন বিগ্রহ কে আমাকে বদলাইয়া দিয়া গেল? ইহারও শরীর সেইরূপ ফুলে গড়া, কিন্তু সেই ফুলের মত কোমল ভালবাসার সুরভিমাখা মনটি কোথায়

গেল? বিধাতা এ মূর্ত্তি ফুলে নির্ম্মাণ করিয়া মনটি পাষাণে গড়িয়া এই গৃহে কোন্ সময়ে রাখিয়া গেলেন?"

—"বন্ধু, তুমি শাসন কর না কেন?"

—"শাসন করিব? প্রথমতঃ আমার এত সোহাগের পুতুলকে শাসন করিতে আমার মন চায় না, দ্বিতীয়তঃ শাসন করিলে সে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহাতে উহার একটুও বাধিবে না। এই সংসারের উপর উহার এতটুকুও টান নাই।"

—"এরূপ স্ত্রী না থাকিলেই বা কি? থাকিলেই বা কি? এখনও তো তুমি তাহাকে পাইতেছ না। চলিয়া গেলে ইহার উপর আর বেশী কি হইবে?"

—"ভাই, আমাকে এরূপ কথা বলিও না, আমি সেই শাস্তি সহিতে পারিব না। তবু তো তাহার মুখখানি দেখি। অপরের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তাহার মুখে যে হাসি ফুটিয়া উঠে, তাহা তো দেখিয়া চক্ষু জুড়াই! ইহাকে ছাড়া আমার পাঁজর ধ্বসিয়া পড়িবে, আমি বাঁচিব না।"

বাজাসন অঞ্চলের ঘরে ঘরে এই দুঃখ। কেহ বা কখনও মুখ ফুটিয়া বলে, কেহ বা বলে না। কিন্তু সমস্ত দেশটায় যেন আগুন লাগিয়াছে এবং সে আগুনের শিখা বাজাসনের ধর্ম্মস্থান হইতে আসিয়াছে। স্বীয় স্থান হইতে ধর্ম্ম যেন পাগলের মতনিজের সৃষ্টি নিজে নষ্ট করিয়া দেশলাই কাঠি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছেন!

বাজাসন-রাজ্যের দুর্দ্দশার শেষ এখানেই নহে। মহারাজা বয়সের আধিক্যের জন্য ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছেন।

গোঁড়া ব্রাহ্মণদের হাতের পুতুলের ন্যায় মন্ত্রী জাতি-ভেদের কড়াকড়ি বেশী করিয়া করিতেছেন। গর্গ নিজের পূজা-অর্চ্চা ও ধ্যান-ধারণা লইয়া ব্যস্ত। তিনি বর্ণাশ্রমের পক্ষপাতী হইলেও এতটা গোঁড়ামি কখনই পছন্দ করিতেন না। অপেক্ষাকৃত অল্প-শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সভাসদেরা নিজেদের সহিত অপরাপর শ্রেণীর প্রভেদ দম্ভভরে ঘোষণা করিয়া দেশের সমস্ত মনুষ্যকে তৃণবৎ মনে করিতেছেন। চাঁড়াল, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি জাতিরা দরবারে প্রবেশ দূরের কথা, রাজধানীতে প্রবেশ করিতে হইলেও দরবারের হুকুমনামা দেখাইতে হয়। দেশীয় ভাষায় যে সকল যাত্রা ও ভাটিয়াল সুরের গান, দেবতাদের মঙ্গল গান, তরজা গান গাহিয়া রাজা-প্রজা সকলের তুষ্টি সাধন করিত, দরবারে সে সকল দেশী ভাষার সঙ্গীত একেবারে অচল। "ছি, ছি", "পথ ছাড়," "কি আপদ" এই সকল কথা গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মুখে লাগিয়াই আছে।

হায়রে! এই দরবারের জন্য, এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিজয়ের জন্য না জনসাধারণ তাহাদের বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়াছে! ইহারাই না রাজলক্ষ্মীর আসন কাঁধে করিয়া আনিয়া রাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠিত করিয়াছে! আজ ইহাদের এই অবস্থা! পল্লীব্যাপী তথাকথিত মড়কে তাহারা উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, রাজবৈদ্যেরা তো ফিরিয়াও একবার তাকাইতেছে না। দু'টা মিষ্ট কথাও তাহারা কোথাও পাইতেছে না। কেবল ঘৃণা, কেবল উপেক্ষা! এদিকে বাজাসন সম্বন্ধে যে সকল গুজব রটিতেছে, তাহার এক বর্ণও যদি সত্য হয়, তবে তাহারা নিজেরাই মঠটি গুঁড়া করিয়া ফেলিবে।

সহজিয়া গুরুরাই যদি তাহাদের কুলবধূদিগকে বিগ্‌ড়াইয়া থাকে, বাজাসনের তান্ত্রিকেরাই যদি তাহাদের সন্তানদিগকে ষড়যন্ত্র করিয়া হত্যা করিয়া থাকে, তবে তাহারা 'সব-দেওয়া-বাবা'র কোন কথা মানিবে না, সর্দ্দারকেও গ্রাহ্য করিবে না। বাজাসনের ধর্ম্ম-সাধনা তাহারা সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিবে; ভণ্ডদের গেরুয়া বস্ত্র তাহাদের রক্তে রঞ্জিত করিবে। মানুষের সহিত মানুষের কিসের প্রভেদ? বহু পূর্ব্বে ত্রিশঙ্কু নামক চণ্ডাল এক ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত তাহার সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন শার্দ্দুলকর্ণ নামক পুত্রের বিবহ দিতে চাহিলে ব্রাহ্মণ রাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে সে বলিয়াছিল—"তোমরা যে আমাদের অপেক্ষা বড়, তাহা প্রমাণ কর। তোমাদের দুই পায়ের জায়গায় তিনটি পা আছে, দেখাইতে পার? দুই চক্ষুর জায়গায় কি তোমাদের তিন চক্ষু আছে, না মাথায় কোন দৈব আদেশের তক্‌মা সহ তোমরা জন্মিয়াছ? তোমরা কি আম-জামের মত ভেদাত্মক নিজের স্বতন্ত্র কোন রূপ লইয়া জন্মিয়াছ যে, তোমাদিগকে দেখিলেই বুঝা যাইবে, তোমরা কুমড়া নহ, অলাবু নহ। তোমাদের স্ত্রীরা কি ব্যাভিচার করে না এবং তাহার ফলে ভিন্ন শ্রেণীর রক্ত কি তোমাদের রক্তে মিশিয়া যায় নাই? তোমরা কি একটা ভিন্ন হাঁড়িতে রাঁধিয়াই বড় হইয়াছ? এ সকল বুজরুকী ছাড়।

ত্রিশঙ্কুর একটা কথার উত্তর ব্রাহ্মণটি দিতে পারেন নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে এই কাহিনী বর্ণিত আছে। এই সকল ব্রাহ্মণ-দৌরাত্ম্য, তান্ত্রিক-দৌরাত্ম্য, সহজিয়ার-দৌরাত্ম্য আমরা আর সহিব

না। বাজাসন অঞ্চলের সমস্ত চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত্ত, সাহা এই সকলে মিলিয়া ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র পাকাইতেছিল। তোমরা কেন খাওয়ার সময় আমাদিগকে দেখিলে উঠিয়া যাইবে,—রাজধানীতে ঢুকিতে হুকুমনামা চাহিবে? অথচ কুকুর বিড়াল পুষিয়া, আদরে কোলে বসাইয়া তাহাদের সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইবে? সমস্ত বাজাসন অঞ্চলটা বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া রহিল। শোকে তাহারা পাগল হইয়াছে। অত্যাচার, অবিচার, অকৃতজ্ঞতায় তাহারা রাজদ্রোহ করিতে উদ্যত; দেশটা যেন একটা বারুদখানায় পরিণত হইল।

তেরো

"কেন এত ফুল তুলিলি সজনী
যতন করিয়া ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে কভু কি সজনী, পরে লো রজনী
তারার মালা?
আর কি পরিব বনফুল হার?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার?
অলি-বঁধু তার, কে আছে রাধার?
হতভাগিনী ব্রজের বালা?"

—মাইকেল।

* * * * *

"তুয়া সে রহলি মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল কলরব দু'কূল
কান্থ কানু করি' ঝুর॥
কুসুম ত্যজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুটই
তরুগণ মলিন সমান।
সারী, শুক, পিক, ময়ূরী না নাচত
কোকিলা না করত হি গান।"

—গোবিন্দ দাস।

* * * * *

"অকথন ব্যাধি তাহা কহন না যায়।
যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়॥
পায়ে ধরি' কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতুলী যেন ধূলায় লুটায়॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥"

—চণ্ডীদাস।

রাজা অত্যন্ত পীড়িত শুনিয়া যুবরাজ বাজাসনে চলিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি তথায় না থাকায় দেশের অবস্থা তিনি ভালরূপ জানিতেন না। রাজা অসুস্থ, সর্দ্দার যুদ্ধের পর কতকটা নিশ্চেষ্ট এবং জনসাধারণের মনঃপীড়ার আঁচ তাঁহার মনকেও স্পর্শ করিয়াছে। তিনি অবশ্য বাজাসনের ষড়যন্ত্রের কথা জানেন না, কিন্তু তথাপি রৌয়াতে যে মড়ক লাগিয়াছে, এবং তথাকার বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ যুবকেরা যে প্রতি মাসেই মরিয়া

যাইতেছে, তাহাতে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত। রাজবৈদ্যের সঙ্গে সর্দ্দারের দেখাশুনা করাও এখন কতকটা দুর্ঘট। জাতের কড়াকড়ি বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি কয়েকবার চেষ্টা করিয়া রাজবৈদ্য বিষ্ণু কবিরাজের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার পল্লীর দুরবস্থার কথা জানাইয়াছেন। বিষ্ণু কবিরাজ বলিলেন—"আমি ইহার কিছু কিছু শুনিয়াছি। গোঁড়া উচ্চ সমাজ আমার উপর নিষেধ-বিধি জারি করিয়াছেন, আমি তোমাদের পল্লীতে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দরবারে ঢুকিতে হইবে। 'বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো।' যতই কড়াকড়ি করিবে, ততই শুচি-বায়ু বেশী হইবে। নৈসর্গিক বিধান এত বাড়াবাড়ি সহে না। তবে আমি কি করিব? এটা তো মড়ক বলিয়া আমার কাছে মনে হয় নাই। এ বৎসর এতগুলি লোক মরিল, কিন্তু জরাতুর, অঙ্গহীন, অতি বৃদ্ধ, ইহাদের একটিও মরে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, একটি স্ত্রীলোকও মরে নাই, চণ্ডাল ভিন্ন অন্য কোন জাতির কেহও এই মড়কে মরে নাই। আমার মনে হয়, সাভারের কোন প্রতিহিংসার ষড়যন্ত্র ইহার মধ্যে আছে। বাছিয়া বাছিয়া কেবল কি যুদ্ধক্ষম, জোয়ান, চণ্ডাল-ছেলেরাই মড়কের হাতে পড়িবে! যে সকল লক্ষণের কথা শুনিয়াছি, কবিরাজী শাস্ত্র মিলাইয়া তাহার কোন লক্ষণ বা নিদান তো কোথাও পাইতেছি না। সর্দ্দার, পল্লীটিকে আপনি যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। কোনরূপ বাসি বা পচা মাংস খাওয়া নিষেধ করিয়া দিন্, এবং বাহিরের কোন লোককে সহজে গ্রামে ঢুকিতে দিবেন না। যদি কেহ আসিয়া পড়ে, তবে গুপ্তচর

নিযুক্ত করিয়া তাহার গতিবিধি ও ক্রিয়া-কলাপের খোঁজ রাখিবেন। আমি এই কয়েকটি বড়ি দিতেছি, তাহা যুবকদিগকে রোজই একটি করিয়া খাইতে দিবেন, যদি বিষাক্ত কিছু শরীরে ঢোকে, তবে তাহাতে উপকার হইবে।

সর্দ্দার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, অতিশয় চিন্তিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাজ পীড়িত, সমস্ত কথা যুবরাজের কাছে জানাইলেন। যুবরাজ তাঁহার বিশ্বস্ত কয়েকজন গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারা পল্লীর সমস্ত সংবাদ গোপনে তাঁহাকে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে জানাইতে লাগিলেন; এদিকে শ্যামল ও কজ্জলের প্রকৃত পরিচয় তিনি সর্দ্দারকে দিলেন এবং 'সব-দেওয়া-বাবার' ইচ্ছাক্রমে তাঁহাদের যে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহাও জানাইলেন। যুবরাজ বলিলেন—"স্বামীজির ইচ্ছা যে, বাজাসনের রাজধানীতে উৎসব করিয়া এই বিবাহ পুনঃসম্পাদিত হয় এবং কজ্জলের মাতা, সাভারের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর স্ত্রী ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ উৎসবে যোগদান করেন, কিন্তু এখনও তাঁহাদের অশৌচ চলিতেছে, আর আট নয় মাস পরে বিবাহোৎসব সম্পাদিত হইবে।"

সেনাপতি—"শ্যামল সাভারের রাজাই হোক, কিংবা উচ্চকুল-সম্ভূত অপর কোন সম্প্রদায়ভুক্তই হোক্ সে চিরকালই আমার পুত্রস্থানীয় থাকিবে। তাহার সুখ ও আনন্দ ভিন্ন জগতে আমার কিছুই কাম্য নাই। কজ্জলকে একদিন মাত্র দেখিয়াছিলাম; দেখিয়াই উল্কা রায়কে বলিয়াছিলাম, সংসারে আমার শ্যামলের যোগ্য কন্যা যদি কেহ থাকে, তবে এই কজ্জলই।"

চৌদ্দ

এদিকে সিংহপুরে (সিঙ্গুরে) বিষ্ণুর মন্দিরে থাকিয়া সেই বালকবেশী বধূ ও শ্যামল বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা যেন সেই দেশের বন-দেবতা। উভয়ের রূপমাধুরী দেখিয়া বাতাস যেন প্রসন্নভাবে বহিতে থাকে, কোকিল ডাকিয়া উঠে, তড়াগে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। এ সকল স্বাভাবিক দৃশ্য তো নিত্যই হয়। কিন্তু দম্পতির মনে হয়, যেন তাহাদেরই জন্য প্রকৃতি দেবী উৎসব করিয়াছেন। উভয়ের হাসি উভয়ে নিত্যই দেখেন, কিন্তু তাহা ফুলের মত একদিন পরে বাসি হইয়া যায় না, নিত্যই নূতন।

একদিন কজ্জল বলিল,—"প্রথম যেদিন তোমাকে আমি দেখিলাম, সেই দিনই আমার মনে যেন পুষ্প-বৃষ্টি হইল। সেই দিন হইতে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটি দিনও তোমার কাছ-ছাড়া হইতে ইচ্ছা হয় নাই। যে তিনটি দিন তুমি দূরে থাকিতে, এবং আমাকে এড়াইয়া যাইতে, সেই তিন দিন আমার আহার-নিদ্রা চলিয়া গিয়াছিল। মনে হইত, যেন আমার মাথার মূল্যবান মুকুটটি কেহ কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, আমার জীবনের প্রয়োজন নাই।"

শ্যামল বলিল—"আমরা সাভার হইয়া বাজাসনে যাইব। যুদ্ধকালে একটি বৎসর আমরা তোমাদের অঞ্চলে ছিলাম; তখন একটু অবসর পাইলেই আমি শিশুপালের গড়ে যাইতাম। কতদিন

অশ্ব-পৃষ্ঠে অবলোকিতেশ্বরের মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছি।" কেন জানি না, সেই স্থান আমার এত প্রিয় মনে হইয়াছে, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আমার সর্ব্বদা কালিদাসের "রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাশ্চ নিশম্য শব্দান্" শ্লোকটি মনে পড়িত।" উত্তরাংশ কজ্জল পূরণ করিয়া দিল,—"তৎচেতসি স্মরতি নূনং অবোধপূর্ব্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তর কার্য্যানি।" শ্যামল বলিতে থাকিত, "সেই বনের দৃশ্য দেখিয়া আমার চক্ষের তৃপ্তি হইত না। শিশুপালের আম-বাগানে সিঁন্দুরে আমগুলি দেখিলে মনে হইত, যেন কতকাল ধরিয়া আমি তাহা খাইয়া আসিয়াছি। মাতৃস্তন্যের মত সেগুলি সুধা-মধুর। সেখানকার হাওয়া আমার বুক জুড়াইয়া দিত, সেখানকার টগর ফুলগুলির স্পর্শ আমাকে মায়ের স্নেহ-স্পর্শ মনে করাইয়া দিত।"—"বলিতে বলিতে শ্যামলের ছুটি চোখে জল ভরিয়া আসিল।

কজ্জল তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"ওকি! তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

গদ্‌গদকণ্ঠে শ্যামল বলিল—"এই শিশুপালের গড় ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষুৎপিপাসাতুরা আমার মা একদিন রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া পদব্রজে চলিয়া গিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, আমার মায়ের মত সুন্দরী সে অঞ্চলে আর কেহ ছিল না। রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশতিলক মহেন্দ্রের পুত্রবধূ এই দুর্গম পাহাড়িয়া পথ ভাঙ্গিয়া চলিবার সময় যেন কতবার সেই কোমল চরণ দু'টি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। হায়-মাতৃচরণ! আমি একবারও তাহা মস্তকে

ধরিতে পারিলাম না। তাহা হইলে আমার সমস্ত শিরঃপীড়া চলিয়া যাইত।”

শ্যামল এইবার অর্দ্ধস্ফুট শব্দে কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল— “কজ্জল, আমি সেই সময় তাঁহার একটি বোঝা হইয়া দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিলাম। আমার কি আর রাজ ঐশ্বর্য্যের প্রতি কোন লোভ থাকিতে পারে? মা লিখিয়াছেন—‘আমার এই ছেলে যেন কাঠুরিয়া হইয়া কাঠ কাটিয়া জীবন কাটায়, লাঙ্গল চালাইয়া ক্ষেত চষিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে চিরায়ু হইয়া বাঁচিয়া থাকুক, রাজ্য-সুখ যেন সে চায় না।’ কথাগুলি শেলের মত আমার বুকে বিঁধিয়া আছে। সেই শিশুপালের গড়ের একটি স্থান ছায়া-শীতল, নবমল্লিকা, অপরাজিতা ও অতসী ফুলের গাছে ভরা, আমি কতদিন সেখানে যাইয়া বসিয়াছি। মনে হইয়াছে, যেন মাতৃ-অঙ্কে স্থান পাইয়াছি! হয়ত পথক্লান্তি ও রাত্রি জাগরণে দুর্ব্বলা মা আমার সেইখানে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেখানে হয়ত তাঁহার পদরজঃ পড়িয়া আছে, নতুবা তাহা এত ভাল লাগিবে কেন? সেখানে ময়ূরেরা নাচিতে থাকিত, কোকিল ডাকিয়া উঠিত,—মনে হইত, যেন আমাকে পাইয়া তাহারা মাতৃমঙ্গল উৎসব করিতেছে। কজ্জল, সেই সকল স্থান দেখিতে আমার আবার ইচ্ছা হয়। সাভারের হীরাখচিত সিংহাসন পড়িয়া থাকুক, কিন্তু আমার মা বনদেবীর মত যে জায়গায় স্নেহভরা হৃদয়টি লইয়া চূড়ান্ত কষ্ট পাইয়া মৃত্যুর দ্বারে যাইতেছিলেন, সেই পুণ্য তীর্থটি আমার আবার দেখিতে সাধ যায়। সাভারের রাঙা তটভূমিতে,

সারি সারি সুপারি গাছগুলি কি সুন্দর!, ধলেশ্বরীর উত্তাল ঢেউয়ের খেলায় সেখানে কত ডিঙ্গি ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া যায়, কোন কোনটি ডুবিয়া পড়ে, সেই ভয়ঙ্করা ধলেশ্বরী কেন আমার চক্ষে এত ভাল লাগিত, তাহা আমি এখন বুঝিতেছি। আমি কতবার যুবরাজকে বলিয়াছি, 'সাভার যদি আপনি জয় করেন, তবে রাঙামাটির দেশের একটি স্থান আমাকে দিবেন, আমি সেখানে বাড়ী করিব।' যেদিন সাভার ছাড়িয়া সিংহপুর আসি, সেদিন এই পল্লীর দিকে চাহিয়া আমি চোখের জল থামাইতে পারি নাই, কেন চোখে জল আসিত, বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু প্রিয়তম কোন সামগ্রীর বিচ্ছেদে মন যেমন ছিঁড়িয়া যায়, আমার তেমনই কষ্ট হইত! মনে হইত, আমি আর এই পল্লী দেখিতে পাইব না।"

আঁচল দিয়া স্বামীর চোখ মুছাইয়া—কজ্জল বলিত,—"কেন দেখিতে পাইবে না? সাভার তো এখন তোমাদেরই। সেখানে তুমি বাড়ী নির্ম্মাণ কর। শিশুপালের গড়ের সেই সকল স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া মাতৃমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিও।"

শ্যামল আবার বলিল,—"যেদিন তোমার ভগিনীপতি, আমার কাকা যুবরাজের মৃত্যু হয়, সেদিন যে শোক পাইয়াছিলাম, তাহা বলিবার নহে। যখন পোড়াবাড়ীটা হইতে তাঁহার অর্দ্ধ দগ্ধ শরীরটা বাহির হইল, ওঃ সে কি নিদারুণ দৃশ্য! মনে হইল, যেন এমন দুঃখ আমি আর জীবনে পাই নাই। তাহার অমল-ধবল শতদলের মত মুখখানি লাবণ্যে ঢল ঢল করিতেছিল,

তাঁহার চোখ দুটি নিম্ন দৃষ্টি হইয়া যেন আমাকে দেখিতেছিল, যেন আমার প্রাণের সহিত তাহার প্রাণের গোপন কথা চলিতেছিল! সে কথা তো তখন বুঝি নাই! এখন বুঝিতেছি, তিনি আমার কত প্রিয়, কত অন্তরঙ্গ ছিলেন।"

বলিতে বলিতে শ্যামল তাহার মায়ের চিঠিখানি বাহির করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—"এই দেখ, আমার মায়ের হাতের অক্ষর। তিনি যেমন সুন্দরী ছিলেন, লেখাগুলিও তেমনই সুন্দর ছিল। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে লেখা, না খাইয়া, না ঘুমাইয়া, উৎকট জ্বরের প্রকোপের সময় লেখা এই সুদীর্ঘ চিঠির একটি অক্ষরের রেখা বাঁকিয়া যায় নাই, হেলে নাই! তুমি কি জান, এই চিঠি আমার মুমূর্ষু মাতা লিখিয়াছেন,—ইহা তাঁহার আত্মিক সংবাদ, তাঁহার সমস্ত মাতৃহৃদয়ের স্নেহসারে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় ইহা লেখা, নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রদীপ যেরূপ উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে, সে শিখায় দৌর্ব্বল্যের কোন চিহ্ন থাকে না,—মায়ের এই আশীর্ব্বাদী চিঠিখানি সেইরূপ সমস্ত মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-বলে বলীয়ান্। তাই এই দীর্ঘ বাইশ বৎসর পরেও আজকার লেখার মত উজ্জ্বল হইয়া আছে, তাই এই লেখায় স্বাস্থ্যের অনাবিল পূর্ণতা, অক্ষর সুস্পষ্ট, সবল, রেখাগুলি সতেজ, সুগঠিত ও সুদর্শন।"

কজ্জল বলিল,—"আর কাঁদিও না। দেশে যাইয়া তোমার মাতার স্মৃতি-মন্দির রচনা করিয়া আমরা তাঁহার পূজারী হইব।"

শ্যামল—"না, কজ্জল, আমার মন যেন বলিতেছে, ভোগসুখ আমার কপালে নাই। তোমাকে বড় দুর্লভ বোধ হইতেছে।

মনে হইতেছে, যেমন করিয়া মাতাকে হারাইয়াছি, তেমন করিয়া তোমাকেও হারাইব। এই হতভাগ্য স্নেহ-ভিখারীর অদৃষ্ট বড় মন্দ ; যাহার স্নেহ পাই, তাহাকেই হারাই।"

এই কথায় কজ্জল কাঁদিয়া উঠিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিল। হঠাৎ সর্প স্পৃষ্ট হইলে পথিক যেমন চম্‌কিয়া উঠে, তেমনই বিস্মিত হইয়া শ্যামল বলিল,—"একি করিতেছে কজ্জল? এই এলাকা ব্রহ্মচর্য্যের নিজ স্থান, এখানে তোমার সঙ্গে আমার বেশী ঘনিষ্ঠতার বাধা আছে।" এই বলিয়া কোমল লতার মত কজ্জলের ভুজ-বন্ধন সে তাহার কণ্ঠ হইতে ধীরে ধীরে আল্‌গা করিয়া দিয়া বলিল—"কজ্জল, সত্যই কি তোমায় পাইব? তুমি যে আমার কত তপস্যার ফল! এই দুর্লভ ধন ভগবান আমাকে দিয়াছেন। আবার তো কাড়িয়া লইবেন না?"

কজ্জল বলিল,—"আজ কেন এমন করিতেছ? চারিদিকে আকাশে বাতাসে পুলকের ঢেউ খেলিতেছে। চল, আমরা আনন্দের কথা বলি। তোমার দুঃখ দেখিলে যে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়, তাহা কি বুঝ না?"

ধীরে ধীরে শ্যামল তাহার মাতার চিঠির দিকে অতি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"লক্ষ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা অপেক্ষাও এই চিঠিখানি আমার নিকট মূল্যবান্। এই চিঠিতে আমার মাকে পাইয়াছি। যে স্নেহ মানুষ একবার মাত্র পায়, যাহাতে একবার মাত্র ভগবান্ সদয় মূর্ত্তিতে দেখা দেন, এই চিঠিতে সেই দয়াময়ের দয়ার মূর্ত্তি আঁকা আছে। এই স্নেহের শেষ নাই। এই বাৎসল্য

ভগবানের কৃপার মতই অনন্ত, মৃত্যুর কাছে যাইয়াও ইহা মৃত্যু যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়। দুঃখ এই যে, সম্পূর্ণ স্নেহ, তাঁহারই যত সম্পূর্ণ স্নেহ,—দিয়া তিনি জননী-মূর্ত্তি গড়েন, কিন্তু তাঁহার অসীম শক্তির এক বিন্দুও মাতাকে দেন না, সমস্ত শক্তি তিনি নিজের কাছে লুকাইয়া রাখিয়া অসমর্থ বাৎসল্যকে তিনি কেবল জীবন-ব্যাপী কষ্টের কারণ করিয়া সৃষ্টি করেন। যদি তিনি মায়ের সহস্র আশার অনুরূপ একবিন্দু শক্তি তাঁহাকে দিতেন, তবে মাতৃস্নেহ কি এত দুঃসহ যন্ত্রণাময় হইত? আজ এই চিঠিখানি পাইয়া আমার বুক কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। চল, বিষ্ণু-মন্দিরে ঘণ্টা বাজিতেছে। আরতি আরম্ভ হইয়াছে, শ্রীমন্দিরে তুমি আমাকে ছাড়া থাকিও না। 'সব-দেওয়া-বাবা' অন্তর্য্যামী, তাঁহার কাছে আমরা যেন কোনরূপ দোষী না হই।"

উভয়ে মন্দিরে ফিরিয়া আসিল। 'সব-দেওয়া-বাবা' দেখিলেন, উভয়ের চক্ষু নির্ম্মল, তাহাতে শুধু পবিত্রতা প্রতিভাত হইতেছে। তাহাদিগকে আরতির পর লুটের দুইখানি বাতাসা দিয়া মাথায় হাত রাখিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু বহু কষ্টে নিরুদ্ধ তাঁহার একটা দীর্ঘশ্বাস দম্পতির কাছে ধরা পড়িয়া গেল। হায়! সাধুর মনও বিচলিত হয়!

পনের

শ্যামল ও বধূকে বাজাসনে লইয়া আসিবার জন্য রাজা যুবরাজকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। গোঁড়ার দল কাণাকাণি করিয়াছিল। জন্ম পর্য্যন্ত যে চণ্ডালের গৃহে পালিত এবং যাহার বংশে জাতি-বিচার নাই, তাহার ও তাহার বধূকে আনিবার জন্য স্বয়ং যুবরাজ কেন যাইবেন? দরবারের সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত। কিন্তু সে সময় গর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার গঞ্জনাসূচক দৃষ্টিতে এই সকল কথাবার্ত্তা বেশী দূর গড়াইতে পারিল না।

যুবরাজ তাঁহার সৈন্যসামন্তের সঙ্গে নবদম্পতি ও কিশোরীকে রওনা করিয়া দিলেন। কিন্তু 'সব-দেওয়া-বাবা' যুবরাজকে কয়েকটি দিন বিষ্ণু মন্দিরে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। একদিন সন্ন্যাসী যুবরাজকে বলিলেন—"তোমাকে উৎকণ্ঠিত ও চিন্তিত দেখিতেছি, কেন বল তো?"

যুবরাজ—"বাজাসন অঞ্চলে যে ষড়যন্ত্র ও দৌরাত্ম্য চলিতেছে, তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম, ভিক্ষুধর্ম্ম কিছুই থাকিবে না। গৌড়েশ্বরের চিরন্তন বিধির বলে মঠের অধ্যক্ষের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত। আমরা কেবল রাষ্ট্রীয় শাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। গুপ্তচরদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার এই অক্ষম দু'টি বাহু ও অসহ্য কষ্টসহ মন লইয়া পৃথিবীতে একদিনও বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না।

আমাকে হুতাশনে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার আদেশ দিন।"

সন্ন্যাসী—"যুবরাজ, একি বলিতেছ? পৃথিবী যুগে যুগে এক একটা ভাবের নেশায় মাতিয়া যায়, তখন ভুলগুলি সত্য বলিয়া মনে হয় এবং যুগের হাওয়া এমনই প্রবলভাবে বহিতে থাকে যে, তাহা যে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পায়, তাহা তাহার সামর্থ্যে কুলায় না এবং সে তথাকথিত বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপহাসের পাত্র হয়। কিন্তু জানিও, সূর্য্যের গতি যেমন কোন একস্থানে যাইয়া থামে না, সেইরূপ এই সকল যুগের প্রাধান্যও অচল হইয়া তিষ্ঠিয়া থাকে না। সহজিয়াদের মধ্যে অনেক দুষ্কৃতি, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম এবং ব্যাভিচার চলিতেছে কিন্তু তথাপি তাহারা বড় কয়েকটি আদর্শের আভাস পাইয়াছে। তাহারা জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ উঠাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদের কেহ কেহ শুধু রাগানুগা প্রীতির সন্ধান পাইয়াছে। কুমার, আমি দেখিতেছি, ইহাই ভগবানের শ্রীমুখের বংশী-ধ্বনি। যে এই সুর একবার শুনিয়াছে, সে কিছুতেই ইহা ভুলিতে পারিবে না। জোলা যেমন থলিয়া বুনিতে থাকে, কিন্তু যদি সে একবার মস্‌লিন দেখে, তবে কখনই মোটা চট বুনিয়া তৃপ্ত হইবে না—আদর্শ তেমনই করিয়া লোককে পীড়ন করে। একবার যে দেখিয়াছে, সে মজিয়াছে। মর্কট আঁকিতে আঁকিতে যদি পরী আঁকিবার স্বপ্ন কাহারও মনে জাগে, তবে সে মন হইতে কিছুতেই সেই স্বপ্নের মূর্ত্তি ফেলিয়া দিতে পারিবে না। যুগ-চক্রের নেমি ঘুরিতে ঘুরিতে এমন এক

সময় আসিবে, যখন তাহার পরী আঁকার স্বপ্ন সফল হইবে। আমি চারিদিক হইতে বাঁশীর সেই ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। যেন দেখিতেছি, কোন সোনার মানুষ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া বিশুদ্ধ প্রেম শিখাইতে যাইয়া চণ্ডালের পদরজঃ মাথায় লইতেছেন, যেন তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসে, চক্ষের জলে বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা টুটিয়া যাইতেছে। যেন স্বর্গ হইতে দেবতারা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ধূলায় লুটাইতেছেন। কাহারও পাকা শ্মশ্রু বুক ছাপাইয়া পড়িয়াছে! সেই অশীতিপর বৃদ্ধ বালকের পা ধরিয়া দেব-দর্শন করিতেছেন, কেহ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়া পতিতদের হাতের রান্না তৃপ্তির সহিত খাইতেছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া আছেন। তিনি পতিতের গলা ধরিয়া কাঁদিতেছেন; আর দেখিতেছি, গোমাংস যাঁহাদের ভক্ষ্য ছিল, যাঁহারা স্বর্ণ-সিংহাসনে সম্রাটের পাশে বসিতেন, তাঁহারা নেংটি পরিয়া গাছের তলায় বিরাগ-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কত রাজপুত্র তাঁহাদের কথায় রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছেন! ঐশ্বর্য্য ও আসক্তি তাঁহাদের পায়ে লুটাইতেছে। জমাট আঁধারের মত তমাল-বীথির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা এক একটি বৃক্ষের নীচে এক এক রাত্রি শয়ন করিয়া কাটাইতেছেন, পাছে কোন এক স্থানের উপর আসক্তি জন্মে। পোড়া রুটি দিয়া নেংটিপরা সন্ন্যাসীরা যে ভগবানের ভোগ দিতে পারিতেন না, তাঁহার ভোগের জন্য এত বড় মন্দির উঠিয়াছে, যাহার গুম্বজের নীচে রাজপ্রাসাদগুলির চূড়া পড়িয়া আছে। অনাহারী, অযাচকবৃত্তি সন্ন্যাসীদের ইঙ্গিতে

বিপুল অরণ্যানী অত্যাশ্চর্য্য অট্টালিকা পূর্ণ বিশাল নগরীতে পরিণত হইতেছে। ঐ দেখ, পুর-ললনারা লাজ-সম্ভ্রম ছাড়িয়া এক দেব-কল্প পুরুষের পাছে পাছে ছুটিয়াছে, "তাহার পদ্মপলাশ চক্ষু নিয়ত বর্ষণ-সিক্ত শতদলের মত জলভরা। সেই তরুণ সন্ন্যাসীর মুখ-পঙ্কজ দেখিবার জন্য শত শত মশাল জ্বালিয়া ভক্তেরা রাত্রি জাগিয়া উৎসব করিতেছে! সেই অশ্রু-সম্বল, কৌপীন-সার যুবকের ইঙ্গিতে সম্রাটের প্রতিনিধি স্বীয় অট্টালিকা হইতে নামিয়া তাঁহার পূর্ব্ব নিষেধবিধি উল্টাইয়া দিতেছেন ও সেই তরুণ-রূপ দেখিয়া শ্মশ্রুবহুল মুখ বারংবার অশ্রুপূর্ণ হইতেছে। আর দেখিতেছি, সমস্ত দেশ জুড়িয়া খোলের বাদ্য বাজিতেছে। বক্তৃতা নাই, প্রচার নাই, যে তাহা শুনিতেছে, সে-ই সেই বাদ্যের নেশায় মাতিয়াছে, চাষা লাঙ্গল ভাঙ্গিয়া করতাল গড়াইতেছে, রাজ-পরিচ্ছদ ছাড়িয়া রাজা গেরুয়া পরিতেছে! এক দস্যু সম্রাট্ তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য গুরুপদে সমর্পণ করিয়া তাঁহার বড় বড় স্তম্ভ সমন্বিত বিশাল প্রাসাদের যে নক্সা করিয়াছিলেন, তাহা কাটিয়া ফেলিয়া বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন। সেই সকল মন্দিরের সুবিস্তৃত আঙ্গিনায় ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কৈবর্ত্ত, বণিক নাম কীর্ত্তন করিয়া এক সঙ্গে গড়াগড়ি দিতেছে, সেই কীর্ত্তনের গায়েন ধোপা-নাপিত এবং দোহার বিশুদ্ধ বংশ জাত ব্রাহ্মণ। সমস্ত জাতীয় লোক প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ। হাড়ি ও মুচিরা স্বর ধরিয়াছে—"সে যে জাতের বিচার মানে নারে, দেখ্‌বি যদি আয় সকলে।" সেই গান শুনিয়া করতলে তালি দিয়া গোঁড়া গোঁসাই ঠাকুর অশ্রুতে

গণ্ড ভাসাইতেছেন। ভাগীরথীর উপকূল কীর্ত্তনে, নর্ত্তনে, খোল করতাল বাদনে ইন্দ্রপুরী হইয়া যাইতেছে। কুমার, একি দৃশ্য! আমার জীবনে কুলাইবে না, এই দৃশ্য এখনও আমার কাছে স্বপ্নের মত, বাস্তব জীবনে দেখিতে পাইব না।"

শ্যামল,—"এ স্বপ্ন আপনি কেমন করিয়া দেখিতেছেন?"

স্বামীজি—"যে চোখ দিয়া তোমরা দেখ, সেইরূপ চোখেই আমি দেখিতেছি।"

শ্যামল—"আমরা দেখিতে পাই না কেন?"

স্বামীজি—"দেখ, জীবজগৎ; কোন কোন উদ্ভিদ্‌ভোজী জীবের বড় বড় চোখ, তথাপি তাহারা পুষ্পের শোভা দেখিতে পায় না। তাহাদের দৃষ্টি শুধু উদর-পুর্ত্তির দিকে। ফুলের শোভা দেখিবার যে দৃষ্টি, তাহা তাহারা পায় নাই। পাইলে কি এমন সুরভি, এমন সৌন্দর্য্য যে ফুলের, তাহা এক গ্রাসে খাইয়া ফেলিতে পারিত? তোমাদের চক্ষু আছে, কিন্তু আমার যে দৃষ্টি হইয়াছে, সে দৃষ্টি হয়ত কেহ কেহ পায় নাই। সর্ব্বগ্রাসী ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা তাহাদের আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কুমার, আমি যেমন প্রত্যক্ষভাবে এই আশ্রম, ঐ নদী দেখিতেছি, তেমনই প্রত্যক্ষভাবে সেই অনাগতকালের আগন্তুকদিগকে দেখিতেছি। হিরণ্যকশিপু স্তম্ভ দেখিয়াছিল, কিন্তু সেই স্তম্ভের মধ্যে যে দেবতা, তাহা দেখিবার যোগ্য দৃষ্টি সে পায় নাই, এই জন্য তাহার দুর্দ্দশা। জনসাধারণের এজন্য দুঃখের অন্ত নাই। আর বেশী কিছু বলিব না; তুমি শুনিয়াছ, তুর্কীরা আসিতেছে, অচিরে হয়ত তাহারা দেশ গ্রাস

করিয়া ফেলিবে। আমাদের যুগসঞ্চিত পাপের ফলে হয়ত আমাদেরই অনেক লোক তাহাদের পন্থী হইবে, ভাই ভাইকে ভুলিবে,—পিতার গলায় পুত্র ছোরা বসাইবে! যে মন্দির-রক্ষার জন্য পিতা প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহারই বংশের দুলালেরা সে মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, বিগ্রহকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া ফেলিবে এবং অপবিত্র করিবে! কিন্তু এই সকল ধর্ম্মযুদ্ধের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ফকিরী ভাব আছে, ঝুলি-কাঁথার দিকে দৃষ্টি আছে, সেই ভাব কখনও এদেশে লুপ্ত হইবে না,—তাহাদের পথ এক এবং পরিণামে তাহারাই সাম্যভাব আনয়ন করিবে। কিন্তু দেশে বহুদিন ধরিয়া একটা কাটাকাটি, মারামারি চলিবে। কুমার, জীবন-মরণ তাঁহারই ইচ্ছাধীন জানিও; আমরা সকলেই একটা বড় ভাবের মধ্যে আছি,—তাহা সমুদ্রের মত আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাহার কুল-কিনারা দেখিতে পাই না। অবস্থান্তর হইলেই আকুল হই। সেই বড় ভাবের তাড়নাটা যে আমাদিগকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে ক্রমাগত দ্রুতবেগে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—আমাদেরই শুভ পরিণতির দিকে, তাহা না বুঝিয়া আমরা অবস্থান্তরে ব্যথিত হই। কুমার, শাস্ত্র-জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, প্রতিষ্ঠা, হঠযোগে অর্জ্জিত শক্তি,—এগুলি জীবনের পরিধিমাত্র স্পর্শ করিতেছে, সংযমও তপস্যাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কোটি কোটি দীপ থাকিলেও অন্ধ যেরূপ দেখিতে পায় না, তপঃ-প্রভাব বিরহিত লোক তেমনই সহস্র পাণ্ডিত্য-সত্ত্বেও পথের নির্দ্দেশ পায় না। কচ্ছপ যেরূপ

শৈবাল ও আবর্জ্জনা ঠেলিয়া মুহূর্ত্তকাল জলের উপর গ্রীবা বাড়াইয়া সূর্য্যকে দেখিতে পায়, আবার বহু জন্মের সংস্কার ও আসক্তির জন্য ডুবিয়া পড়ে, সংযম ও তপস্যার অভাবে মানুষগুলি শুধু পাণ্ডিত্য-বলে ক্ষণেকের জন্য পথ দেখিতে পায়; কিন্তু সে পথে সে তিষ্ঠিতে পারে না। তপস্যা ও ধ্যান ধারণার ধাপে-ধাপে মানুষ নব নব সত্যের আভাষ পায়, তাহাই তাহাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়। আশা করি, তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হইবে। শেষ কথা, ভোগের রাজ্যে তুমি ভোগ-সুখ-বিতৃষ্ণ হইয়া থাকিও, এই নিবৃত্তিই এ দেশের সার সম্পত্তি। অন্যান্য দেশের প্রবৃত্তির আলোক জ্বলিতেছে, নিবৃত্তি দেবী সেখানে নৈবেদ্য পান নাই। ভারতবর্ষ এখন পর্য্যন্ত সেই দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। যদি এ দেশের এমন কোন প্রহরণ থাকে, যাহাতে ভারতবর্ষ জগজ্জয়ী হইবে, তবে নিবৃত্তিই সেই প্রহরণ। এখানে বিংশ-হস্ত, দশমুখ রাক্ষস বা সহস্র-শীর্ষ দেবতা কিছু করিতে পারিবে না। এ দেশের দেবতা ভিক্ষুক, তাঁহার কুড়াইয়া পাওয়া বাঘছাল, তাঁহার কুড়াইয়া পাওয়া ভোঁতা ত্রিশূল, কুড়াইয়া পাওয়া বুড়ো বলদ, কুড়াইয়া পাওয়া শ্মশানের হাড়মালা। এ দেশের দেবতার কুড়াইয়া পাওয়া বাঁশের বাঁশী, কুড়াইয়া পাওয়া গুঞ্জাফলের মালা, কুড়াইয়া পাওয়া পাখীর পালকের মুকুট, কুড়াইয়া পাওয়া বনফল, কুড়াইয়া পাওয়া নেংটিপরা সখা। এদেশ ভোগের জন্য হয় নাই,—এ নিকড়িয়া দেবতার দেশ। যেদিন ভারতবর্ষ ভোগ-সুখের জন্য হাত বাড়াইবে, ঐশ্বর্য্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে,

সেদিন সে মরিবে। কুমার, দেখ, সূর্য্যদেবতা দিনরাত্রি নিজের দেহের অণু-পরমাণু পোড়াইয়া সেই চিতাশয্যায় তিনি শুইয়া আছেন; প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্ত ভোগ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। নিবৃত্তি ও আত্মিক শক্তির প্রভাবে তাঁহার তেজ ও সৌন্দর্য্য অক্ষয়। তিনি জগৎকে শীতল জলধারায় স্নিগ্ধ করিতেছেন, তিনিই পুষ্পকে বিকশিত করিয়া নানা বর্ণের মাধুরী দেখাইতেছেন। তিনি সৌর জগতের কেন্দ্র, প্রতি গ্রহ-উপগ্রহকে নব নব শোভায় উদ্ভাসিত করিয়া জীবনমণ্ডিত করিতেছেন। ভোগ বিনষ্ট হইলে আত্মিক শক্তি এইরূপে বাড়ে। ভোগ সুখ দেয় না, 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব' কেবল ক্ষুধা বাড়াইয়া জীবকে চিরচঞ্চল, চির অস্থির করিয়া রাখে। এই ভোগের রাস্তায় পা দিও না। বিদ্যা-বুদ্ধি, পদ-প্রতিষ্ঠা, অধিকার রূপগুণ তোমার সকলই আছে। ইহার একটি থাকিলেই প্রলয় ঘটাইতে পারে। সুতরাং তোমার চারিদিকে আকর্ষণ, চারিদিকে প্রলোভন। শুধু নিবৃত্তি দ্বারা তোমার এই জন্মগত শক্তিগুলি দমাইয়া রাখিতে পার।

ষোল

"অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥
কৈছনে যায়ব যমুনা তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞে যাঁহা কয়ল কুলরখেরি।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥"

—বিদ্যাপতি।

শ্যামলের বাজাসনের পথে টাঙ্গাইল অবলোকতেশ্বরের মঠে পিতামহ মহেন্দ্র সেন ও পিতামহী মহারাণী ভাগ্যশ্রী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। পুত্রশোকে মহারাজা শয্যাশায়ী। তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেন না।

তিনি বলিতেন,—যুবরাজের শ্মশানের ধূমে তাঁহার চোখের দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে। কিছুদিন তিনি একেবারেই দেখিতে পাইতেন না, এখন একটা চোখে দেখেন। তাঁহাকে ধরিয়া বসাইতে হয়, একরূপ জীবন্মৃত। কিন্তু সেই বহুদিনের হারানো পৌত্র, নয়নের মণি, আসিয়াছে শুনিয়া, তিনি দুই বাহু প্রসারণ করিয়া উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শ্যামলকে দেখিয়াই চিনিলেন, এ তাঁহার সেই হারানো ধনের ছেলে। উভয়েরই মুখে কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও স্নেহ দিয়া তিনি কুমারকে জড়াইয়া ধরিলেন।

শ্যামল বলিলেন—"আমি এখন বাজাসনে যাই, কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আপনাদিগকে লইয়া সাভার যাইব।"

মহেন্দ্র সেনের তাপিত বক্ষ যেন জুড়াইয়া গেল। তিনি জোড়হাত ঊর্দ্ধে উঠাইয়া বলিলেন,—"হে অবলোকিতেশ্বর, প্রভু, তুমি এমনই করিয়া ভাঙ্গাবুক জোড়া দিতে পার।"

কিন্তু মুস্কিল হইল মহারাণী ভাগ্যশ্রী দেবীকে লইয়া। ঠিক যে বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার বিমলেন্দু নিহত হ'ন, শ্যামলের এখন সেই বয়স, তিনি তাঁহাকে কুমার বলিয়া ভ্রম করিলেন,—এই নাতিই যেন তাঁহার ছেলে। কিছুতেই তাঁহার এ ভুল গেল না। তিনি বলিতে লাগিলেন—"তুই আসিলি, আমার বধূমাতাকে কোথায় ফেলিয়া আসিলি? দেবশিশুর মত তাহার ছোট্ট খোকাকে কোথায় রাখিয়া আসিলি?"

সকলে কত বুঝাইল, সেই ছোট খোকাই শ্যামল, কিন্তু তাঁহার মাথা বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল, কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। ভিষক্ সদাশিব কত করিয়া বুঝাইলেন—"আপনার ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে তো এখন তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হইত। প্রায় ২২ বৎসর হইল তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।" কিন্তু ভাগ্যশ্রী দেবী কিছুতেই তাহা বুঝিতেন না। তিনি বলিতেন—"তোমরা কি আমাকে পাগল পাইয়াছ? সে ছেলে তো কাল যুদ্ধে গিয়াছিল, আজ আসিয়াছে। তোমরা পাগল হইয়াছ নাকি? আমি শোকে, দুঃখে জর্জ্জরিত, আমাকে লইয়া উপহাস করিও না।"

শ্যামল আসিয়া মহারাণীর কাছে বসিতেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন—"না, মা, আমি তোমারই ছেলে।" ইহা বলিতে তাঁহার মাতাপিতৃশোক নূতন করিয়া হইত এবং তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত। "হাঁ, মা, আমি কালই যুদ্ধে গিয়াছিলাম, বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এজন্য কাল রাত্রে তোমার কাছে আসিতে পারি নাই।"—এই বলিয়া তিনি পিতামহীর গা ঘেঁসিয়া বসিতেন। মহারাণীর বুক সেই স্বর্গ-সুখে জুড়াইয়া যাইত, বাইশ বৎসরের ব্যথার কণাটিও থাকিত না।

এই শোকার্ত্ত পিতামহ ও পিতামহীকে বুঝাইয়া বাজাসনে আসিতে চেষ্টা করিয়া মঠেই তাঁহার দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এই সময়টা তিনি সর্ব্বদা মহারাণীর কাছে বসিয়া থাকিতেন। কারণ, ভাগ্যশ্রী দেবী তাঁহাকে চোখে হারাইতেন। শ্যামল দেখিলেন,—সংসারটা নিরন্তর স্নেহ-মমতার জাল বুনিতেছে। এক দিকে প্রকৃতি সুখের স্বর্গ রচনা করিতেছেন, অপর দিকে নিয়তি মানুষের কোমল বৃত্তিগুলি লইয়া কি নিষ্ঠুর খেলাই না খেলিতেছেন!

যাহা হউক, প্রায় দুই সপ্তাহ মঠে থাকার পর, অনেক বুঝাইয়া শুঝাইয়া,—অনেক প্রবোধ দিয়া শ্যামল সাভারের দিকে রওনা হইলেন।

সভের

বাজাসনাধ্যক্ষ একদিন অপরাহ্ণে নান্নার বিহার-লগ্ন দীঘিটির ধারে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে অজিনাসনে তাঁহার পার্শ্বচর মণিবজ্র উপবিষ্ট। দীঘির পূর্ব্বপার হইতে অশোক পুষ্পের গুচ্ছগুলি সবুজ পত্রের অন্তরাল হইতে দেখাইতেছে—যেন সত্তবলি-সমাহিত খড়্গখানির রক্তরঞ্জিত ফলকটি। চৈত্র-সন্ধ্যায় মনোরম মলয়-বায়ু বহিতেছে। সম্মুখে সন্ধ্যামালতীর গাছ হইতে ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যাইতেছে ও দুই একটি সবুজ ছোট পাখী তাহার কোমল শাখাগুলিতে বসিয়া ফুলের কুঁড়ি ঠোকরাইতেছে। পশ্চিম আকাশের সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভায় তাহারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি কাক উড়িয়া সেই লাল রক্তের মধ্যে কালির বিন্দুর মত আকাশে দেখাইতেছে। অধ্যক্ষ ফাউচের শরীর মলয়-সমীরণে জুড়াইতেছে না, পাখীর ডাক, কি শিউলী ফুল তাহার মনে কোন রেখাপাত করিতেছে না। কি যেন দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার মন-প্রাণ ডুবিয়া আছে। এমন সময় হঠাৎ মন্দিরের বাহিরে নানারূপ বাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং একজন ভিক্ষু দৌড়াইয়া মঠস্বামী মহারাজকে জানাইল— "সর্দ্দার সেনাপতির ভ্রাতুষ্পুত্র, যুবরাজের ব্যায়াম-গুরু যুদ্ধ জয় করিয়া বাজাসনের তথাগতের শ্রীমূর্ত্তি, মঞ্জুশ্রী, বিক্ষোভ্য ও পঞ্চধ্যানী বুদ্ধকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন।"

ফাউচ্ বলিলেন—"দাও মন্দিরের দরজা খুলিয়া, আমরা ব্রাহ্মণদের মত সঙ্কীর্ণচেতা নই। ভিক্ষুদের আশ্রমে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই।"

শ্যামল মন্দিরে যাইয়া তথাগতকে প্রণাম করিলেন। একটা ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া ফাউচ্ তাহার সুদর্শন মূর্ত্তি, কপাটসদৃশ বক্ষ ও প্রশস্ত ললাট লক্ষ্য করিয়া মণি বজ্রকে বলিলেন—"একি চণ্ডালের পুত্র! চেহারা দেখিয়া আমার তো তাহা বোধ হয় না।"

মণিবজ্র—"স্বামীজি মহারাজ, ইহার নাম শ্যামল। ইনি যুবরাজকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন,—এজন্যই মন্ত্রীর কত রাগ! ইনি সর্দ্দারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হংসরাজের পুত্র, এতদিন প্রবাসে ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর দেশে ফিরিয়াছেন।"

ফাউচ্—"তুমি ঠিক জান, এই যুবক চণ্ডাল?"

মণিবজ্র—"ইহা হইতে লোকে আবার কিরূপে ঠিক করিয়া জানে? ইহার চণ্ডালকুলে জন্ম বলিয়া যুবরাজের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা অনুচিত, এজন্য গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা সকলেই বিরক্ত। এমন কি, একদিন দরবারে উপস্থিত ছিলাম, সেদিন কোন কোন ত্রিপুণ্ড্রক ও তিলকধারী ব্রাহ্মণ আমার সম্মুখে রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ যে পর্য্যন্ত আপনি আছেন, সেই পর্য্যন্তই আমাদের এখানে আসা; তাহার পর এই দরবারে চাঁড়াল, বামুন এক হইয়া যাইবে। যুবরাজ তো এই চাঁড়াল যুবককে না দেখিলে এক দণ্ডও থাকিতে পারেন না।"

ফাউচ্—"তুমি ঠিক জান, এই যুবক চাঁড়াল?"

মণিবজ্র—"আর কতবার বলিব? আপনি এই মঠেশ্বর, আমার নাম মণিবজ্র, এই বিহারের নাম বজ্রাসন, এই সকল কথা যেমন সত্য, সর্দ্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্যামলের চণ্ডাল-কুলে জন্ম এবং এই যুবকই তাহার উত্তরাধিকারী এ কথাও তেমনি সত্য। মহারাজ ত ইহাকে কয়েকখানি গ্রাম অপুত্রক সর্দ্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়াই দান করিয়াছেন।"

ফাউচ্—"মণিবজ্র, এ যদি চণ্ডাল হয়, তবে আজ বড় শুভ দিন, আমার অভীষ্ট নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। আজ তোমাকে দিয়া আমার যে সহায়তা হইবে, তেমন সাহায্য তুমি কিংবা অন্য কোন শিষ্য গুরুকে করে নাই। বল তুমি আমার কাজে অটল থাকিবে?"

মণিবজ্র—"আপনি আজ এমন করিতেছেন কেন বলুন তো? আপনি জানেন, আমার দেহ, মন, সমস্তই আপনার সেবায় সমর্পণ করিয়াছি। আপনার সেবাই আমার ধর্ম্ম, আপনার আদেশ পালন করাই আমার পুণ্য, আপনি বিপদে আমার রক্ষা-কর্ত্তা ও তপস্যার সিদ্ধি।"

ফাউচ্—"আমি তাহা জানি। তবু আজ যে বিষয়টি বলিব, তাহার উপর আমার জীবনের সুদীর্ঘ তপস্যার ফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এজন্য আমাকে একটু বেশী উতলা দেখিতেছ। দেখ মণিবজ্র, এই যে ছেলেটি, সর্দ্দার সেনাপতির ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহার শরীরে যে সমস্ত লক্ষণ দেখিলাম, তাহা অন্য কোন চণ্ডাল-যুবকের মধ্যে নাই, আমি বহু খুঁজিয়াও তাহা পাই নাই। আমার দ্রাবিড় দেশীয় গুরু আমাকে এই সকল লক্ষণের কথা বলিয়া দিয়াছেন,—

উরু ও মুষ্টি কঠিন, কুক্ষি ও বক্ষ উন্নত, চক্ষুর প্রান্তভাগ, নখ, কর ও পদতল রক্তবর্ণ, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা হ্রস্ব, দেহ চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, মণিবন্ধদ্বয় পরস্পর সমান, মস্তক তিনটি আবর্ত্তে শোভিত,—এই সমস্তই লক্ষণই শ্যামলের শরীরে আছে ; অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছি। মঠে প্রণাম জানাইয়া ও উপঢৌকন দিয়া আজ রাত্রে শিবিরেই ঘুমাইয়া আছে, আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ইহাকে পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছি, এ একটি নিখুঁত বলি। আমি শবের উপর বসিয়া সাধনা করিয়াছি, কিন্তু গুরুদেব বলিয়াছেন "এইরূপ লক্ষণযুক্ত কোন চণ্ডাল যুবকের উপর বসিয়া অমাবস্যা তিথিতে শনি কি মঙ্গলবারে যদি সারারাত্রি আরাধনা করিতে পার, তবে সেইদিন তোমার সিদ্ধি হইবে, সেইদিন তুমি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের আধিপত্য লাভ করিতে পারিবে। তুমি ইঙ্গিত করিলে সম্রাটেরা তাঁহাদের রাজমুকুট তোমার পায়ে ফেলিয়া দিয়া তোমার আজ্ঞাধীন হইবে। কিন্তু সে বালক যদি চণ্ডাল জাতীয় না হয়, তবে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

মণিবজ্র—সর্দ্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র যে চণ্ডাল-জাতীয়, তাহা সকলেই জানে (তখন পর্য্যন্ত শ্যামলের ইতিহাস এবং তাহার নূতন পরিচয় বাজাসনে অবিদিত ছিল, কেবল সর্দ্দার জানিয়াছিলেন)। কিন্তু শ্যামলকে পাওয়া বড় কঠিন। বৃদ্ধ রাজা তাহাকে ছেলের মত দেখেন ; যুবরাজের সে প্রাণ-প্রিয়, প্রজারা তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সর্দ্দার তাহাকে চোখে হারান, এ যে কালনাগের লেজ লইয়া খেলা।"

ফাউচ্—"মণিবজ্র, এ করিতেই হইবে। তাহা না হইলে জীবনই নিষ্ফল, সিদ্ধিলাভের পর বাজাসন্দের গদি তোমাকে দিয়া আমি চলিয়া যাইব। কিন্তু এই কার্য্যে বিফল হইলে আমি আত্মঘাতী হইব। আগামী অমাবস্যার পরদিন তাহা হইলে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না,—আমার দেহ কানাই নদের জলে ভাসাইয়া দিও।"

মণিবজ্র—"আপনি স্থির হউন, আমি চেষ্টা করিব, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই।"

ফাউচ্—তোমার উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করে।

—:*:—

ফাউচ্—"কি সংবাদ? আজ দশ দিন গেল, এখন পর্য্যন্ত কি করেছ?"

মণিবজ্র—"ব্যাপার একটু কঠিন হইয়াছে। প্রথম দিন ঔষধ সেবনের পরে শ্যামল অসুস্থতা বোধ করে, সেনাপতি পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে থাকে; আমি যাইয়া ঔষধ দিয়া আসি। শ্যামল ঔষধ খাইয়া বলে—'কাকা, মণিবজ্র আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, আপনি রাজবৈদ্যকে খবর দিন। সর্দ্দার রাজ-বৈদ্যের পায়ে ধরিয়া কান্নাকাটি করিলে শ্যামলকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—'দস্তুরমত অল্পশক্তির বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। সর্দ্দার আপনি ব্যস্ত হইবেন

না, আমি ঔষধ দিতেছি ; ইহা এখনই খাওয়াইয়া দিন। একটু ভাল হইলেই শ্যামলকে স্থানান্তরিত করিবেন। যাকে তাকে আপনাদের পাড়ায় ঢুকিতে দিবেন না এবং যার তার ঔষধ কাউকে দিবেন না।' সেই রাজবৈদ্যের বড়ী খাইয়া শ্যামল অনেকটা সুস্থ হইয়া গিয়াছে।

ফাউচ—"এখন কি করিবে ঠিক করিয়াছ ?"

মণিবজ্র—"বহু-হস্ত অবলোকিতেশ্বরের যে মূর্ত্তি এই আশ্রম-সংলগ্ন ছোট মন্দিরটায় আছে, তাহার কপালে একটা বড় পদ্মরাগ মণি আছে।"

ফাউচ—"উহার দাম অত্যন্ত বেশী। চন্দ্ররাজাদের এক কুমার আরোগ্য হওয়ার পর প্রাচীনকালে তাহাদের কোন রাজা এই দুর্লভ মণিটি আমাদের বিহারে দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার মানত ছিল। ইহা দিয়া কি হইবে ?"

মণিবজ্র—"এই মণিটি এক বালককে দিতে হইবে। সে শ্যামলের বন্ধু, এবং অনেক সময় তাহাদের বাড়ীতে থাকে। সে-ই রাজবৈদ্যের কাছে যাইয়া রোগীর অবস্থা জানাইয়া তাহাকে ঔষধপত্র আনিয়া দেয়। সেই ছেলেটির নাম রত্নপ্রভ শেঠ। সে একজন ভাল জহুরী,—তাহার মণিমাণিক্য প্রবালের দোকান আছে। সে এই পদ্মরাগ মণিটি দেখিয়া বলিয়াছিল,—'এ রকম দ্বিতীয় একটি কোথাও দেখি নাই। এমনটি যদি পাই, তবে বোধ হয় আমি জীবনও দিতে পারি।' আমার সেই কথা মনে ছিল। আমি একদিন তাহাকে বলিলাম—"তুই ওই পদ্মরাগ

মণিটি চাস্? আমি ওটা দিতে পারি। কিন্তু আমার কথা রাখ্‌তে পারিবি?" তখন তাহাকে সমস্ত কথা অতি গোপনে খুলিয়া বলিলাম।

ফাউচ্—"এটা কি ভাল করিয়াছ? সে যদি প্রকাশ করিয়া ফেলে! অবশ্য যদি আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হয়, তবে পদ্মরাগ মণি দিতে আমার আপত্তি নাই।"

মণিবজ্র—"কিন্তু রত্নপ্রভকে আমি শপথের পর শপথ করাইয়া তবে বিষয়টি জানাইয়াছি। সে প্রথমতঃ এমন ভাব দেখাইল, যেন সে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহার পর তাহাকে মণিটি কত শত বৎসর পূর্ব্বে কোন্ রাজার কাছ থেকে পাওয়া গিয়াছিল এবং কত যে জহুরী ইহা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া গিয়াছে, তাহার বর্ণনা দিতে লাগিলাম। তাহার ফলে দেখিলাম, সাপ যেরূপ মন্ত্রবলে ফণা তুলিয়াও কামড়াইতে ভুলিয়া যায়, তাহারও সেইরূপ অবস্থা হইল। সে স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু এখন তো ধীরে বিষ-প্রয়োগের সময় নাই। অমবস্যা পরশু-দিন। সেই দিন একটা বিষেই উহাকে শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে।"

ফাউচ্—"তাই কর বাবা। তাহার পর সিদ্ধিলাভ হইলে আমাদের পায় কে?

—:*:—

এই সকল বিয়োগান্ত ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিবার আর ধৈর্য্য নাই। রাজবৈদ্যের ঔষধের নাম করিয়া রত্নপ্রভ শ্যামলকে সেই

মণিবজ্র প্রদত্ত বিষ খাওয়াইল। বিষ খলে গুলিবার সময় তাহার হাত বারংবার কাঁপিতেছিল, বুক দুরু দুরু করিতেছিল। কিন্তু সে পদ্মরাগ মণির স্বপ্ন দেখিতেছিল,—যেন কুহকিনী দুশ্চারিণী পরী তাহার কাঁধে ভর করিয়াছিল।

ঔষধ খাইয়া শ্যামল "কাকা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; রত্নপ্রভ খিড়কীর দ্বার দিয়া পলাইয়া গেল।

শ্যামল সর্দ্দারকে বলিল—"আমি মরিতেছি; আমার বুকের কাছে একটা কৌটা আছে, তাহা কজ্জলকে দিবেন। আমি আর কথা বলিতে পারিতেছি না, নিদারুণ বিষের জ্বালায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে।"

এদিকে চণ্ডাল বাড়ীতে লোক মরিয়াছে, শুধু এই বিবরণী লিখিয়া ফাউচ্ শবটি বাজাসনে আনিবার প্রার্থনা জানাইয়া রাজদ্বারে লোক পাঠাইলেন। রাজা মুমূর্ষু, সুতরাং মন্ত্রী অত্যন্ত ব্যস্ত। তিনি সে বিবরণী পাঠ না করিয়া, কে মরিল, কি রোগে মরিল, প্রভৃতি অত্যাবশ্যক সংবাদের ঘরগুলি যে পূর্ণ করা হয় নাই, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বিবরণীতে দস্তখত করিয়া পাঠাইলেন। সর্দ্দার যখন মূর্চ্ছাপন্ন, তখন ফাউচের চর গৃধ্রের মত চণ্ডাল-গৃহে ঢুকিয়া শব লইয়া চলিয়া গেল।

অমবস্যার দ্বিপ্রহর রাত্রে যখন কালী-পূজার ঢাক বাজাসন মঠ হইতে অতি উচ্চ রোলে বাজিতেছিল, তখন সেই কংস,

করতাল, জয়ঢাক, কাড়া-নাকাড়ার গগনভেদী শব্দে সর্দ্দারের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান পান নাই, দেখিলেন, তাঁহার পদতলে বসিয়া একটি যুবক কাঁদিতেছে।

যুবক রত্নপ্রভ শেঠ। সে অতি ধীরে বলিল—"সেনাপতি মহাশয়, আপনি কি আমার কথা শুনিবেন ?"

সেনাপতি—"এখন আমার কোন কথা শুনিবার কাণ নাই, দেখিবার চোখ নাই, অনুভব করিবার প্রাণ নাই! আমার শ্যামল কোথায় ? তুমি না তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলে ?"

তখন দীর্ঘনিঃশ্বাসের ঝড় বহিল, চোখের জলের বাণ ছুটিল। শ্রেষ্ঠী বৈশ্য সর্দ্দারের পা'দুটি জড়াইয়া ধরিয়া সকল কথা স্বীকার করিয়া বলিল,—"শ্যামলকে আমিই মারিয়াছি, সুতরাং আপনি আমার শিরশ্ছেদ করুন।"

এই সকল কথা শুনিয়া চণ্ডাল-বীর্য্য জাগিয়া উঠিল, সেনাপতি বহ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল।

রত্নগর্ভ বলিল—"সেই মুহূর্ত্ত হইতে যে যমদূতেরা শত মুষলে আমার অন্তরাত্মাকে বজ্রসম আঘাত করিতেছে, তাহাতে আমি পাগল হইয়া যাইতেছি। আপনি আমার শিরশ্ছেদ করুন, তাহাই আমার পাপের একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি।"

সেনাপতি—"আমি বহু বীরের শিরশ্ছেদ করিয়াছি। যাহারা দেশের জন্য লড়িয়াছে, রাজার জন্য প্রাণ দিয়াছে, জাতির গৌরবের জন্য মৃত্যুর জয়-ললাটিকা পরিয়াছে, যাহাদের প্রতি নিঃশ্বাস নিস্বার্থ এবং স্বদেশের মঙ্গল-কামনা-পূত, যাহারা বাম হাত

খণ্ডিত হইলে তাহাতে ঢাল ঝুলাইয়া ডান হাতে খড়্গ চালাইয়াছে, সেই সকল মৃত্যুজয়ী মহাবীরদের শিরশ্ছেদ করিয়াছি। তোর মত চোর, বিশ্বাসঘাতক, অর্থলোভী, নরপিশাচ বণিকের শিরশ্ছেদ করিয়া আমার অসির অপমান করিব না। মরিবি তো কত তড়াগ দীঘি আছে, গলায় কলসী বাঁধিয়া তাহাতে ডুবিয়া মর গে। মরিবি তো বাজাসনের ভিক্ষুদের ঝুল্লিতে অনেক বিষ আছে, তাহার কিছু খাইয়া মর গে। তুই রাজ-যক্ষাক্রান্ত রোগী, তুই কুষ্ঠগ্রস্ত, তোকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা হয়; তুই দূর হ।"

এই বলিয়া উন্মত্তের মত অসি হস্তে সেনাপতি বাহিরে গেলেন। বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী মারা গিয়াছিলেন। আজ তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে দুইটি শব্দ বাহির হইল—"বন-দুর্গা", কই আমার বনদুর্গা? তুমি তো কোন কিছু রাখিয়া যাও নাই, কিন্তু ভগবান্ আমাকে সেইরূপ অমূল্য স্নেহের চিহ্ন দিয়াছিলেন, তাহা পাইয়া আমি তোমার শোক ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই দুইটি বৎসর জলে, স্থলে রণাঙ্গনে কামান, বন্দুক ও ধনুকের মুখে যাদুকরের মত খেলিয়াছি! আমার উৎসাহ অদম্য ছিল, বাহুতে নব যৌবনের বল আসিয়াছিল, মনে আবার রঙ্গীন আশা কত কল্পনার সৌধ গড়িয়াছিল! শ্যামল, আমার দেহ, মন, ভিতর, বাহির জুড়াইয়া দিয়াছিল। তোমার বিবাহ হইবে··· হায়!···" বলিতে বলিতে উন্মত্তের ন্যায় চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, শিরায় শিরায় যেন রক্ত ছুটিতে লাগিল।

সর্দ্দার বাজাসনের পথে যাইয়া দেখেন এক অলৌকিক, অদ্ভুত দৃশ্য। অগাধ, অতলস্পর্শ মলঙ্গার বিল শুকাইয়া গিয়াছে, কানাই নদ কোন দিকে চলিয়া গিয়াছে, ঠিক নাই! তাহার পূর্ব্বতীরে শত শত চিতার মত যে সমস্ত অগ্নিকুণ্ড অমাবস্যায় জ্বলিত, সে সকল কিছু নাই! ভয়ানক ঝড়ে কেবল কতকগুলি ভস্ম উড়িতেছে। যেখানে কানাই নদ ছিল, সে স্থানটা সিকতা-ভূমি হইয়াছে, পশ্চিম পারের পুষ্পোদ্যানের চিহ্নমাত্র নাই!

এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় যে কখন হইয়া গিয়াছে, তাহা আজ সর্দ্দারের মনোযোগ আকর্ষণ করিল না। শাণিত তরবারি হস্তে তিনি মঠে প্রবেশ করিলেন, তথায়,—শুনিলেন, গত রাত্রে ফাউচ্ শবের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন; মণিবজ্র তাঁহার উত্তর সাধক ছিল। ভূমিকম্পে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে; আজ সকালে আশ্রম-গুরুর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহার মন্দিরে কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ।

কিন্তু যে সে ব্যক্তি নহেন, সেনাপতি সর্দ্দার শৈবাল রায়, শত শত যুদ্ধের যোদ্ধা, প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, রাজার দক্ষিণ হস্ত,—বাজাসন মঠের রক্ষক তাঁহাকে কি করিয়া আটকাইবে? প্রতিহিংসায় পাগল সর্দ্দার মন্দিরে ঢুকিলেন। তিনি দেখিলেন পৈশাচিক শূন্য দৃষ্টিতে ফাউচ্ বসিয়া আছেন। বাঘের মত সর্দ্দার তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন, এবং কণ্ঠ সহিত মস্তক মাটিতে কাটিয়া ফেলিলেন। আচার্য্যের পদসেবক মণিবজ্রকেও আর একটি আঘাতে হত্যা করিয়া "কই, কই, এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে

আর কে কে আছে?”—বলিয়া অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে নিজের বুকে অসির ফলা বিদ্ধ করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় স্বগৃহে আসিলেন।

ভাল করিয়া প্রভাত হইতে না হইতেই এই সকল কথা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। মুমূর্ষু সেনাপতির ইঙ্গিতে শ্যামলের সেই কৌটাটি সিংহপুরে প্রেরিত হইল। মৃত্যুকালে সর্দ্দার স্বজাতীয়দের কাছে বলিয়া গেলেন—“শুনিয়াছি স্বধর্ম্মে মরাও ভাল, পরের ধর্ম্ম ভয়াবহ। আমরা চণ্ডাল, ‘সব-দেওয়া-বাবা’র ধর্ম্ম আমাদের নহে। সেই ধর্ম্ম মানিতে যাইয়া আমরা সকলে মরিলাম! তোরা বাবার কথা শুনিস্ না, যাহা অপমান-জনক, তাহা সহিস্ না, যে দেবতা কেবল পৈতাধারীদের এক চেটিয়া, সেই ঠাকুর মানিস্ না।” সর্দ্দারের প্রাণ এই ভাবে চলিয়া গেল।

রাজা মুমূর্ষু অবস্থায় সকলই শুনিতে পাইলেন। তাঁহার আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু জ্ঞান বেশ ছিল। শ্যামলের হত্যা, ফাহাউচের হত্যা, সর্দ্দারের আত্মহত্যা,—এই তিন সংবাদ একত্র হইয়া তাঁহার বুকে যে আঘাত দিল, তাহা আর তিনি সামলাইতে পারিলেন না। তাঁহার শেষ কথা—‘কানাই শুকাইয়া গিয়াছে,—রাজাসনের পাপে আমার এত বড় যে মলঙ্গার বিল, যেখানে লবণ কারবারীদের জাহাজ কালাপানি হইতে আসে, সেই বিলও শুকাইয়া গিয়াছে। যুবরাজ কোন্ পথে, কেমন করিয়া আসিবেন?”

রাজার মৃত্যু হইল। তাঁহার একমাত্র পুত্রের হাতের অগ্নি না পাইয়াই তাঁহার সৎকার-কার্য্য শেষ হইয়া গেল। কানাই নদের

পশ্চিম দিকটা শুকায় নাই,—সেখানেই দাহকার্য্য সমাধা হইল। সেই অগুরু ও চন্দন কাঠের চিতার উপর মহরাণী সাশ্রুনেত্রে আরোহণ করিলেন। রাজাসনের রাজ্য যুবরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এই সংবাদ দেওয়ার জন্য গর্গ রাজধানী সোনার গাঁয়ে চলিয়া গেলেন এবং বৃদ্ধ, অসমর্থ মন্ত্রী অল্পকালের জন্য রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, নিম্নশ্রেণীতে, বিশেষতঃ চণ্ডাল-সমাজে বিদ্রোহের ভাব। সেই বারুদের ঘর কখন যে জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

যুবরাজ দরবারের চিঠিতে সমস্ত কথা জানিয়া সংসার-সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িলেন। 'সব-দেওয়া-বাবার পায়ে পড়িয়া বলিলেন—"এই মাতা-পিতৃহীন, প্রাণপ্রিয় বন্ধুহীন হতভাগাকে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিন। যে কমণ্ডলু আজ হইতে দিবেন, তাহাতেই কুড়ানো ফল-মূল লইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিব। যে গৈরিক, কৌপীন ও বহির্ব্বাস দিবেন, তাহাই আমার পরিধেয়। আর পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য খুঁজিয়া ক্লান্ত হইব না; এই বয়সেই তাহার মূল্য বুঝিয়াছি। এই শোকের তীব্র জ্বালাও হয়ত কালে জুড়াইয়া যাইবে, কিন্তু তদপেক্ষা উৎকণ্ঠা ও শোকের কারণ হইয়াছে কজ্জল। তাহাকে একথা কেমন করিয়া বলিব? তাহাকে কোথায় রাখিয়া যাইব?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"শ্যামলের সংবাদ সহসা তাহাকে দিও না। তাহার মন শ্যামলের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অভিভূত। সে নিজেই টের

পাইবে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ভাষায় তাহাকে জানাইও। এখন তাহাকে লইয়া আমার কাছে এস। রাজাসন বা সাভার, তাহার যেখানে ইচ্ছা ইঙ্গিতে বুঝিয়া তাহাকে সেইখানে লইয়া যাও। তাহার পর তুমি যদি 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' এই কথা হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া থাক, যদি তোমার এখনকার মনের ভাব সাময়িক মর্কট-বৈরাগ্য না হইয়া থাকে, তবে যুবরাজ, আমার কাছেই আসিও; আমার সমস্ত প্রাণ মাতা-পিতৃ-স্নেহ সোদরের স্নেহ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর সখ্যে আর্দ্র হইয়া তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে।"

যুবরাজ কজ্জলকে লইয়া আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন—কজ্জল, তুমি যুবরাজের সঙ্গে চলিয়া যাও। দেখ, প্রেম অতি দুর্লভ জিনিষ; প্রতি গৃহে জননীরা বাৎসল্য-রসে এই প্রেমের পূর্ণ আস্বাদ পান। তথাপি তাঁহাদের কয়জন সুখী? পাখী যেরূপ পিঞ্জরে থাকিলে সে মুক্ত ব্যোম-বিহারী হইতে পারে না, মহাজন যদি তাহার অগাধ ধন-সম্পত্তি গৃহকোণে পুঁতিয়া রাখে, তবে তাহা ব্যবহারের অভাবে বৃদ্ধি পায় না, প্রেমও যদি তেমনই কৌটায় পূরিয়া রাখ, তবে তাহা সার্থক হইবে না। প্রদীপ যদি স্বর্ণাধারের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখ, তবে তাহা কেহ দেখিতে পাইবে না, তাহা সার্থক হইবে না, সমস্ত গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ভূমার মধ্যে ছাড়িয়া না দিলে প্রেম হাঁপাইয়া মরিয়া যায়। দেখ, ফুল তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্যের সার ও সুরভি জগৎকে ছাড়িয়া দেয়, গন্ধবহ প্রতিজনের দুয়ারে দুয়ারে ফুলের কথা বুঝাইয়া দেয়। লোকে

ফুল না দেখিয়াই বলে, 'কি সুন্দর ঘ্রাণ, মালতী কি শিউলি ফুটিয়াছে!' সূর্য্য আকাশে থাকিয়া তাঁহার কিরণ সমস্ত জগৎকে বুঝাইয়া দিতেছেন,—সৌর আলোকে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত বুঝিতেছে সূর্য্য তাহাদেরই। সুতরাং প্রেম কৌটায় পুরিয়া রাখিও না। যদি কৌটা ভাঙ্গিয়া যায় তবে জগৎকে বঞ্চিত করিও না। সেরূপ বঞ্চনা করার অধিকার তোমার নাই;—জন্মে জন্মে কষ্ট পাইয়া তাহা বুঝিবে। প্রেম ছোট নহে অতি বড়, প্রেম ক্ষুদ্র নহে অতি অসামান্য। এই অতিথি ক্ষুদ্র বেশে তোমার কাছে আসিয়াছেন। ইনি অতি মহান্, সমস্ত জগৎ উদ্ধার করিবার পাবনী শক্তি ইঁহার আছে। আমি তোমাকে আর কি বলিব? যদি কষ্ট পাও, তবে আমার কথাগুলি মনে করিও।"

আর কিছু না বলিয়া 'সব-দেওয়া-বাবা' নিজের কক্ষে গেলেন। কজ্জল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লক্ষ্য করিলেন, তিনি বিদায়কালে আশীর্ব্বাদ করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন।

—ঃ*ঃ—

যুবরাজের সঙ্গে অশ্বারোহণে কজ্জল চলিতেছে। চাষীরা হল চালনা করিতেছে;—একজন কৃষাণ-বালক অশ্বত্থ বৃক্ষের নিভৃত ছায়ায় বসিয়া গাহিতেছে,—

'কোন্ না জেলের মাছ খেয়েরে, না দিছিলাম কড়ি।
সেই না পাপে হ'লাম আমি অল্প বয়সে রাঁড়ী॥"

সুরটি ভাটীয়ালী, যাহা পদ্মার মাঝিরা গাহিয়া অনন্ত আকাশ ও নীল, পূণ্যতোয়া নদীকে আবিষ্ট করিয়া ফেলে। "বিধাতা

জীবনের মত আমার মাছ-খাওয়া বন্ধ করিলি! কোন্ জেলের মাছের দাম মিটাইয়া দিতে আমি কোন্ জন্মে ভুলিয়াছিলাম, তাই আমি অল্প বয়সে বিধবা হইলাম!”

সেই বালকের সুরে একটা মর্ম্মান্তিক করুণা! ইহাই ভাটীয়াল রাগের দুরন্ত মোহ। যাহা বাঙ্গলা দেশের পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদী-তীর-বাসীদিগকে উজান জলের ন্যায় তোলপাড় করে, এ যে সেই সুর! আজ কেন কজ্জলের বুকে এই সুর শেলের মত বিঁধিতেছে! আজ কেন ‘সব-দেওয়া-বাবা’ আমাকে উপদেশ দেওয়ার মত কি কতকগুলি তত্ত্বকথা বুঝাইলেন। আমি তো তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কাল তিনি বলিয়াছিলেন যে যাহাকে ভালবাসে, পর জন্মে সে তাহাকে টানিয়া আনে। ভালবাসার আকর্ষণ অতিকায় হস্তীও রোধ করিতে পারে না। দেখ, সতী যে ভালবাসায় দক্ষ-গৃহে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সতী আর এক জন্মে সমাধিস্থ শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছিলেন। এক জন্মে কিছু ফুরায় না। প্রেমের ভাণ্ডার অফুরন্ত, যত দিবে ততই ইহার বিশালত্ব বুঝিতে পারিবে। আমার বিদায়কালে এ সকল তত্ত্বকথা কেন? আমার মন যে সাভারের যুবরাজের সঙ্গে মিলন-আশায় অধীর হইয়া আছে! কই, কোন আশীর্ব্বাদ তো তিনি করিলেন না।”

অমঙ্গলের ছায়া তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। মনের প্রতি স্তর খুঁজিয়া কোন আশার সম্ভাবনা দেখিল না। একস্থানে শিবির পড়িল। সেখানে একজন গাহিতেছিল—

"আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এও বিধি লিখিলা করমে ॥
এই কি ছিল ? আমার ভাগ্যে এই কি ছিল ?
কৃষ্ণ-হারা হ'তে হইল, আমার ভাগ্যে এই কি ছিল ?"

কজ্জল ভাবিল, বাহিরে কি দুঃসহ দুঃখ! যাহার মুহূর্ত্তের অদর্শনে প্রাণান্ত হয়, তাহার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ! এই বিচ্ছেদও আমার ভাগ্যে লেখা ছিল! কজ্জল ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, যুবরাজেরও নেত্রকোণে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। কজ্জল ভাবিল—"আজ যুবরাজ আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন না কেন ? আমার সম্বন্ধে শত কুশল প্রশ্ন, শত রহস্য, শত হাসি ও আনন্দের কথা হয়। আজ যেন সব ফুরাইয়া গিয়াছে। আমার স্বামী তো ভাল আছেন ? এই যে ভাওয়ালের জঙ্গল। তিনি তো এই জঙ্গলের কথা বলিয়া কত কাঁদিয়াছিলেন! এখানে শুক সারী ডালে চুপ করিয়া আছে, ফুটন্ত ফুলের দিকে ফিরিয়াও তাকাইতেছে না কেন ? তাহাদের নৃত্য কি ফুরাইয়া গিয়াছে ? আজও তো ফুল ফুটিয়াছে, কিন্তু অলিকুল ডালে বসিয়া আছে, ফুটন্ত ফুলের দিকে ফিরিয়াও তাকাইতেছে না।"

কজ্জল আর পারিল না, বলিল—"কুমার, বলুন তো আমার সংবাদ কি ? আমার মন যেন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। কি বুঝাইবেন, কি বলিবেন ? আপনার বুঝাইবার ও বলিবার পূর্ব্বেই ছিন্নবীণার ন্যায় আমার হৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে!" বলিতে বলিতে কজ্জল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

যখন অনবরত জল-সিঞ্চনে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল তখন অতি কাতর দৃষ্টিতে কুমারের দিকে চাহিয়া কজ্জল বলিল—"বলুন কুমার, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমার মাতাকে দেখিবার সাধও আজ আমার নাই। আমি এখান হইতে যাইব না, এখানেই আত্মঘাতী হইব। আমার সঙ্গে আপনি কথা কহিতেছেন না? একি! আপনার চক্ষু হইতে অজস্র জল পড়িতেছে কেন? বুঝিয়াছি আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। জানেন যুবরাজ, শোক-সংবাদ গোপন করিলেও শোকার্ত্ত তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু যদি তাহাকে সব কথা বলিয়া দেওয়া যায়, তবে বরং সে মন স্থির করিবার চেষ্টা করিতে পারে।"

যুবরাজ বলিলেন—"এই ত সাভারের রাজপ্রাসাদ, আপনি আপনার রুগ্না, অতিশয় শোকগ্রস্তা মাতার নিকট যান, সকলই জানিতে পারিবেন।"

কজ্জল মায়ের কাছে গেল। বিদ্যুদ্বেগে দুর্ঘটনার কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। কজ্জলের চোখে আর অশ্রু নাই। নব-নিযুক্ত দ্বিতীয় মন্ত্রীকে আদেশ করিয়া গ্রামের যেখানে তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী মরিয়াছিলেন, সেইখানে একটি শিল্প-খচিত কষ্টিপাথরের মঠ তৈয়ারী করিলেন। তাহার বেদী নিম্নে পত্রখানিসহ সেই কৌটাটি প্রোথিত করিয়া পাষাণ, তাম্রাবরণ, ও

পোড়া মাটির পেটিকায় সুরক্ষিত করিলেন। তদুপরি শ্যামলের মাতৃদেবীর মর্ম্মর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহার মধ্যে কজ্জল হাতের শাখা খুলিল না, যে স্বর্ণাভ মণি-খচিত মস্‌লিনের নীল সাড়ী ও জড়োয়া গহণাগুলি পরিয়া সে সিংহ-পুর হইতে আসিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিল না। যিনি এ জন্মের গৌরী, তিনি পরজন্মের উমা, তপস্যায় পুনরায় শিবকে লাভ করিয়াছিলেন। 'সব-দেওয়া-বাবা'র কথাগুলিতে অগাধ প্রত্যয় স্থাপন করিয়া সে এ কয়েক দিন অহোরাত্র তপস্যা করিয়াছে।

সে তপস্যা তাহার শ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে চলিয়াছে। সে কিছুই আহার করে নাই, কিন্তু অনশনে কোন ক্লান্তি বোধ করে নাই; রাতদিনে তাহার চোখের পলক পড়ে নাই। তাহার মুখ একনিষ্ঠ তপশ্চর্য্যার কঠোর পুণ্যের তেজ দেখাইতেছে। অণু-পরমাণু পুঞ্জীকৃত হইলে যেরূপ পিণ্ডাকৃতি ধারণ করে, প্রতি মুহূর্ত্তের একাগ্র তপস্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যেন ফলোৎপত্তির লক্ষণ দেখা গেল। লক্ষ বার নাম জপ করিলে অনেক সময় পণ্ডশ্রম হয়, কিন্তু সংসারের সর্ব্ববন্ধন মুক্ত আত্মা যদি একটিমাত্র কেন্দ্রে স্থির হইয়া তৎভাবে ভাবিত থাকিতে পারে, বিষয়ান্তরে বিচলিত না হয়, তবে আতস কাঁচের উপর সূর্য্য কিরণ কেন্দ্রীভূত হইলে যেরূপ স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি করে, সেইরূপ এই একবিংশাহ-ব্যাপক তপস্যায় তাঁহার আশ্চর্য্য ফল লাভ হইয়াছে। সে বুঝিয়াছে, শ্যামলকে সে পাইবে এবং বেশী জন্ম প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে না। পরদিন প্রাতে সে চিতা

জ্বালিতে আদেশ করিল, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সেকথা পূর্ব্বে কাহাকেও জানায় নাই।

সেই দিনের পূর্ব্বরাত্রে যুবরাজ স্বপ্ন দেখিলেন—"কালদূতেরা রাহুর মত সোনার সুয়াপুরী গ্রাস করিয়াছে। অমনি যবনিকার পরিবর্ত্তন হইল,—তিনি দেখিলেন,—চন্দনকাঠের চিতা জ্বলিতেছে। তাহা হইতে চুয়া ও কর্পূরবাসিত ধোঁয়া উঠিতেছে। সেই চিতায় কে যেন দগ্ধ হইতেছে! তাহার দেহ দেখা যায় না, হাত-দু'খানি দেখা যায় না, সমস্ত শরীর লেলিহান অগ্নির মধ্যে নিশ্চল ও অনড়। কেবল অতি উজ্জ্বল সিন্দুর-রাগে অতিশয় দীপ্ত দর্পণোপম একখানি ললাট দেখা যাইতেছে। মুখখানির একাংশ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় বহু কান্না-কাটির পর যেন প্রশান্ত হইয়া শিশু ঘুমাইতেছে! এ কে? কাহার এ শব? এ কি কজ্জল!

যুবরাজ স্বপ্নোত্থিত হইয়া শুনিলেন, রাজবাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। ঢাক ঢোলের বাদ্য কজ্জল নিষেধ করিয়া দিয়াছে,—সে চিতায় পুড়িয়া ছাই হইতেছে।

আঠার

ইহার পর আর একটি মাত্র ক্ষুদ্র অধ্যায়।

সোনার গাঁ দখল করিয়া তুর্কী সৈন্সরা শুনিতে পাইয়াছিল—বাজাসন বিহারের কথা। এই বিহারে একদা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহা তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে বৌদ্ধদের একটা বৃহৎ বিদ্যাকেন্দ্র ছিল।

তুর্কী গাজীর সৈন্যেরা সুয়াপুরী রাজধানী ঘিরিয়া রহিল। যুবরাজ সেখানে নাই। নিম্ন শ্রেণীর সৈন্যরা সকলেই বিদ্রোহী। মোল্লারা উপদেশ দিতেছে,—"আমাদের ঈশ্বরের কোন রূপ নাই, আমাদের ঈশ্বর পুতুল নহে, আমাদের কোরাণ পুতুল-খেলার গল্প নহে। আমাদের ঈশ্বরের স্থানে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে, তাঁহার পথ কাহাকেও দেখাইতে হয় না। 'আল্লা হু আক্‌বর' বলিয়া পাঁচ ওক্ত নামাজ করিলে তিনি তাঁহার পথ সকলকেই দেখাইয়া দেন। আমাদের মস্‌জিদে ছোট বড় একস্থানে এক পংক্তিতে বসিয়া প্রার্থনা করে। ধর্ম্মের নামে কতকগুলি লোক ঈশ্বর প্রিয় এবং তাঁহার অনুগৃহীত এই ঘোষণা করিয়া পার্থিব সুখ ও ঐশ্বর্য্য একচেটিয়া করিয়া লইবার দাবী করে না। আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ-শূদ্র নাই, রাজা ও প্রজা সকলেই একই আল্লার খিদ্‌মদ্‌গার। তোমরা আইস, বিপথ হইতে সুপথে আইস, আঁধার হইতে আলোকে আইস।"

রোউয়ার সমস্ত চণ্ডাল সর্ব্বপ্রথম ইস্‌লামের দীক্ষা গ্রহণ করিল। তথায় কুম্ভকারেরা পাষাণ ও মৃত্তিকার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গড়িয়া দেশ-বিদেশে চালান দিত, তাহারা ও তথাকার অন্যান্য সকলে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী হইল। চণ্ডালেরা পূর্ব্ববঙ্গে যে যেখানে ছিল, সকলেই কিছুকালের মধ্যে মুসলমান হইয়া গেল।

মোল্লারা বলিল,—"তোমাদের জীবিকা-অর্জ্জন ও আমোদ প্রমোদের জন্য যে যাহা করিতে, তাহা ছাড়িবার প্রয়োজন নাই। মাতৃ-ভাষাই তোমাদের পরম পবিত্র ভাষা; ইহা হইতে কোন ভাষা শ্রেষ্ঠ নহে। কারণ, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা মাতৃ-মুখ হইতে ইহা শিখিয়াছ।"

যাহারা কালিকা-মঙ্গল, মনসামাদল, লক্ষ্মীর পাঁচালী গাহিত, রূপ-কথা ও গীতি-কথা আবৃত্তি করিত, তাহারা সেই সেই কাজে বাদসাহের উৎসাহ পাইল। মাছগুলি জল হইতে যেন ডাঙ্গায় উদ্ধৃত হইয়া পুনরায় জল পাইয়া বাঁচিল। চণ্ডাল ভিন্ন কৈবর্ত্ত প্রভৃতি শ্রেণীরও দশ আনা তৎপথাবলম্বী হইল—যার যার জাতীয় ব্যবসা ও আমোদ-প্রমোদ তাহারা ছাড়িল না, মুসলমান হইয়াও পাঁচালী, রূপ-কথা ও ছড়া গাইতে নিষেধ রহিল না।

তাহাদের সর্ব্বপ্রধান আক্রোশ পড়িল বাজাসন বিহারের উপর। সেই তান্ত্রিক, সহজিয়া, পরকীয়া ও একাভিপ্রায়ী দলের আড্ডা তাহারা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিল। সুয়াপুরীর মন্ত্রী তাঁহার নিজ প্রজাদের হাতেই নিহত হইলেন। যে নান্না ও সুয়াপুর বহু ভৈরবী-চক্রের সমাবেশে "সুয়াপুর, 'নান্না' মদে ভাতে পান্না"

এই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই সুয়াপুর নাম্না রাজাসনের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

সম্রাট্ বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি পন্থ দাশ হইতে অধস্তন ষষ্ঠ বিষ্ণুদাশ ফৌজদারের উপর বিজয়ী মুসলমানেরা সেই অঞ্চলের শাসনভার দিয়া গেলেন। পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিকারী বিষ্ণুদাশ তাঁহার দুই ভ্রাতাসহ শ্রীখণ্ড বালিনছি এবং পশ্চিম-বঙ্গের অপরাপর স্থানের দলবল লইয়া সুয়াপুরে উপনিবিষ্ট হইলেন। ইঁহারাই সুয়াপুরের শাসনভার পাইলেন। তদবধি পন্থ দাশবংশ বহু বিস্তৃত জমিদারী ভোগ করিয়া তথায় প্রভুত্ব করিয়াছিলেন এখনও সেখানে তাঁহাদের বংশ লোপ পায় নাই।

আরও দুইশত বৎসর পূর্ব্বে পালোয়ান গাজি ও ভাওয়াল গাজি চৌরি গ্রাম হইতে ইস্‌লামের ধ্বজা ধরিয়া পূর্ব্ববঙ্গ দখল করেন, তখন ঢাকা তাঁহাদের করায়ত্ত হয়; তখন দাশ বংশ গাজিদের প্রভুত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হন।

শেষ